প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৯

মুদ্রক
বিজয়চন্দ্র চন্দ্র
শ্রীজগদ্ধাত্রী প্রেস
৫।২ শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন
কলকাতা ৭

প্রকাশক
ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড
২৫৪-বি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রীট
কলকাতা ১২

সূচীপত্র

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে তিনটি মার্গের কথা উল্লেখ করেছেন—কর্মমার্গ, রসমার্গ ও জ্ঞানমার্গ। সভা-সমিতি, প্রকাশন, সম্পাদনা প্রভৃতি সাহিত্যে কর্মমার্গের নিদর্শন; রসসাহিত্যে পাওয়া যায় রসমার্গের পরিচয়: আর দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি মননধর্মী রচনায় মেলে জ্ঞানমার্গের নিদর্শন।

গ্রন্থকার শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক যে প্রথম দুটি মার্গে স্বচ্ছন্দ বিচরণের ক্ষমতা রাখেন তার পরিচয় ইতিপূর্বে তিনি দিয়েছেন। 'সাহিত্যতীর্থের' কর্ণধার হিসাবে তিনি সাহিত্যিকদের সহিত সুপরিচিত। সম্পাদনার কাজেও তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এগুলি তাঁর কর্মমার্গের সাধনার নিদর্শন। কবি হিসাবে নবীন কবিদের মধ্যে তিনি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিয়েছেন। তাঁর কাব্যরচনা তাঁর 'মিষ্টিমনের' এবং 'ললিত' ভাষার স্বাক্ষর বহন করে। আলোচ্য গ্রন্থটিতে তাঁর সাহিত্যের জ্ঞানমার্গে বিচরণে স্পৃহার পরিচয় পাওয়া গেল। সুখের বিষয়, প্রথম প্রচেষ্টাই সাফল্যের স্বীকৃতি পাবার অধিকারী হয়েছে। সুতরাং তাঁর লেখনীর এই নূতন ক্ষেত্রে বিচরণের প্রয়াস সর্বথা অভিনন্দনীয়।

রসসাহিত্য ও মননসাহিত্যের লক্ষ্য ভিন্ন হওয়ায় তাদের প্রকৃতিও ভিন্ন হয়ে পড়ে। রসসাহিত্যে বিষয় গৌণ, তাকে যে সজ্জায় সাজানো হবে তাই মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এখানে প্রকাশরীতিই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। তাই সেখানে অলঙ্কারের এত আদর। উপমা, রূপক, সমাসোক্তির সেখানে অকৃপণ হস্তে ব্যবহার হয়ে থাকে।

অপর পক্ষে মননসাহিত্যে বিষয়ই প্রাধান্য পায়। যা বলা হবে তা সুস্পষ্টভাবে বলা হবে, তা তথ্য দ্বারা সমর্থিত হবে—এই উদ্দেশ্যগুলিই সেখানে লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। তাই সেখানে সরস ভঙ্গি হতে সরল, স্বচ্ছ, সহজবোধ্য ভাষার আদর বেশি হয় এবং হৃদয়ের আবেগ হতে যুক্তি অগ্রাধিকার পায়।

বর্তমান সংকলনে মননসাহিত্যে আদৃত এই শ্রেণীর গুণগুলি পরিস্ফুট।

মনে হয় লেখক প্রয়োজনীয় মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই এই নূতন রীতির সাহিত্যরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। তার প্রমাণ হিসবে গ্রন্থটির প্রথম প্রবন্ধে। তাতে মননভিত্তিক সাহিত্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু সারগর্ভ বচন পাওয়া যাবে। যেমন বলা হয়েছে, এই শ্রেণীর সাহিত্যে 'ধান ভানতে শিবের গীত' বর্জনীয়; যেমন বলা হয়েছে মননশীল রচনায় 'ললিতলবঙ্গলতার ভাষা একেবারেই ব্রাত্য'। প্রবন্ধ সাহিত্যে যে প্রকৃষ্ট বন্ধনেরও প্রয়োজন সে কথায় উল্লেখ করা হয়েছে। লক্ষ্য বস্তুর দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে, যুক্তিনিষ্ঠ হয়ে অগ্রসর হওয়াই এখানে রীতি।

লেখক যে গুণগুলির উল্লেখ করেছেন, সেগুলি সংকলনের অন্য প্রবন্ধগুলিতে প্রতিফলিত। তাই রচনাগুলি বুদ্ধিদীপ্ত হয়ে আলোচ্য বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছে। প্রসঙ্গত দেখা যায় বিষয়গুলির গ্রন্থনায় এক যোগসূত্র আবিষ্কার করা যায়। কয়েকজন নির্বাচিত সাহিত্যিকের রচনার মধ্যে স্বাদেশিকতা ও মননশীলতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণই প্রবন্ধগুলির সাধারণ উদ্দেশ্য। লেখক তাঁর 'প্রতিবেদনে' সে কথা উল্লেখ করেছেন। যাঁরা আলোচিত হয়েছেন তাঁরা সকলেই দিকপাল সাহিত্যিক। সুভাষচন্দ্র বসু তার ব্যতিক্রম; কিন্তু সীমিত সাহিত্যকীর্তির মধ্যে তাঁর স্বাদেশিকতার ভাস্বর রূপ তাঁর রচনাকে একটি আকর্ষণীয় আলোচ্য বিষয় করে তুলেছে।

বর্তমান সংকলন গ্রন্থে লেখক যে জ্ঞানমার্গের সাহিত্যসাধক হতে পারেন, তার পরিচয় দিয়েছেন। মননশীল রচনার ক্ষেত্রে তাঁর বিচরণ স্থায়ী হলে আমরা সুখী হব। আশা করি তাঁর পুরাতন প্রেম বিকর্ষণ ঘটিয়ে এই নূতনার প্রতি আকর্ষণ শিথিল করবে না।

স্বদেশ
সাহিত্য
ও
মননশীলতা

বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য ও মননশীলতা

প্রকৃষ্ট রূপে বন্ধন আছে যাঁর বক্তব্যে ও ব্যাখ্যায় তিনিই প্রাবন্ধিক।

এই অর্থে যিনিই যে কোনো ভাবে কোনো বিষয়বস্তুর রূপরীতি ও আকৃতি-প্রকৃতি প্রকাশ করেন পাঠক সাধারণের জন্যে, তিনিই প্রবন্ধকার।

কথাটা এমনভাবেও বলা যেতে পারে যে, যিনি ভেবে-চিন্তে এমন কিছু যদি লেখেন যা পাঠ করলে আবার পাঠককে ভাবতে হবে। অর্থাৎ লেখক তাঁর ভাবনাকে এমন প্রগাঢ় রসের ও রসিকের মানসিকতায় উপস্থাপন করেছেন যে তা পাঠকমানসে ভাবনার নতুন নতুন তরঙ্গ তুলে চিন্তার রাজ্যকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

এই চিন্তার রাজ্যকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারাই সার্থকতার প্রধান ও প্রথম দৃষ্টি প্রবন্ধকারের। ভেবে-চিন্তে একটা বিষয়কে নানা মত ও মতান্তরের পথ দিয়ে নিয়ে যেতে যেতে এমন একটা সিদ্ধান্তে আনতে পারেন প্রাবন্ধিক যেখানে পাঠক প্রবন্ধের বক্তব্যে একেবারে অভিভূত হয়ে বলবেন—'নান্যোপন্থাঃ'।

অন্য পথ বা পন্থা নেই, কি আছে,—এমন সব তর্ক নিয়েও প্রবন্ধের মধ্যে আলোচনা উপস্থাপিত হয়ে থাকে কিন্তু প্রাবন্ধিক তাঁর যুক্তি-জাল এমনভাবে বিস্তার করেন যে পাঠকের মনে প্রবন্ধ পাঠ শেষ করলে মনে হয়—লেখকের সঙ্গে তিনিও এক মতাবলম্বী।

এই একমত করার জন্যেই যে প্রবন্ধ লেখা তাও কিন্তু নয়। কারণ তা যদি হয় তা হলে তো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রচারপত্রগুলিও প্রবন্ধের মর্যাদা দাবি করতে থাকবে। তখন আর সৎপাঠক মহৎনাটকের দর্শক হবেন না অর্থাৎ সত্যিকারের মননশীল প্রবন্ধের পাতাও উল্টেপাল্টে দেখবেন না। পাঠক মনের দৈন্য ঘোচাতে গিয়ে আটক পড়বেন কেন রাজনীতির শূন্য খামারে? সব প্রবন্ধ-নিবন্ধেই যদি রাজনীতির প্রচার গন্ধ উঁকি ঝুকি দেয়, তা হলে?—এমন একটা অহেতুকী আতঙ্কই পাঠককে বীতস্পৃহ করবে যথার্থ প্রবন্ধের মননশীল বক্তব্য গ্রহণের আগ্রহ থেকে। মনের কোণে জানার অনীহা নেই

অথচ 'এলার্জি' বলা যায় এসে যেতে পারে রাজনীতির বিশেষ মতবাদ মাখা রচনা যদি প্রবন্ধের পদ্মবনে মত্তহস্তীর মতো অনুপ্রবেশ ঘটায়।

তাই যুক্তিযুক্ত সব গদ্যই প্রবন্ধ নয় বা সব গদ্যও তেমনি ঠিক যুক্তিযুক্ত প্রবন্ধও নয়।

বোঝার মতো নয়—একটা বোঝার মেজাজ নিয়ে পাঠকব্যক্তিকে নিজের মনের মজলিশে বসিয়ে রাখা এবং তাকে রসিয়ে রসিয়ে পাকা রসুইয়ের মতো জারক-রস পরিবেশন করে যেতে হয়। মতটা সেখানে মতান্তরের অনৈক্য খণ্ডন করতে করতে স্বমতে উপনীত হবে উপসংহারে অর্থাৎ পাঠকের ভিন্নমত যদিও থাকে তা হলেও মতান্তরের হবে সংহার।

উপস্থাপনা প্রাবন্ধিকের সব থেকে জটিল উপাসনা। কি বলছি যেমন তাঁর আদিম চিন্তা তেমনি প্রাথমিক চিন্তা কেমন করে বলছি?

এবং এই কেমন করে বলছি যখন ভাবছেন তখনই আবার ভাবছেন কার জন্যে বলছি!

সাধারণত প্রবন্ধ পাঠক যাঁরা আমাদের সমাজে রয়েছেন, তাঁদের মানসিকতা না জানলেও তাঁরা অতিসাধারণ পাঠকদের চেয়ে কিছুটা উন্নতমানের তা স্বীকার করেই অগ্রসর হতে হয়। মনে হয় তাঁরা বুঝি সবাই সবই জানেন বা বোঝেন কিন্তু ঠিক সময়ে ঠিক উপমাটি মনে করতে পারেন না বা পারছেন না—তাই আলোচ্য বিষয়টিকে যেন আরো আলোকিত করে উপস্থাপনা করা। যেন পাঠককে মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসতে না দিয়ে সব সমস্যারই সমাধান করে দিচ্ছেন প্রাবন্ধিক।

কিন্তু এখানে একটা কথা থেকে যায় এই যে, যদি প্রাবন্ধিক তাঁর প্রবন্ধে সব সমস্যার সমাধান করেই ক্ষান্ত হন তা হলেই হল না, সেই সমাধানটি তিনি ভাষায় উল্লেখ না করেও তাঁর সমস্যা তিনি নির্ভেজালভাবে স্থাপন করতে করতে এমন একটা পর্যায়ে পাঠককে উপনীত করবেন যেখানে প্রবন্ধকারের প্রার্থিত মতেই প্রবন্ধ-পাঠক সেই মতটিকেই মনে মনেও আওড়ে উঠবেন। বলবেন—ঠিকই তো অন্যায় অথবা ভুল হচ্ছে। শাশ্বত সত্যকে পাঠকের মনে যেন প্রবন্ধকার রচনার প্রসাদগুণে ও প্রকাশরূপে স্বীকৃত করান।

একটা ধ্রুবদৃষ্টি নিয়ে যেন শুভদৃষ্টির জন্যে চেয়ে থাকা। একটা ভালোবোধ নিয়ে আলোর কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়াই যেন প্রবন্ধকারের গৌরচন্দ্রিকা থেকে

ইতি টানার শেষ কথায় আসা। সাহিত্য সমালোচনা করা শুধু—তার মধ্যে বিষটুকু প্রথমে সরিয়ে সরিয়ে শেষের দিকে মধুর সন্ধানটুকুকে ধরিয়ে দেওয়া। অনেক লেখার মধ্যে অনেক মন্দ থাকে বলতে হবে কিন্তু যদি একটু থাকে মধু—বাস, সেটুকুই যেন আস্বাদন করিয়ে দেওয়া পাঠকের রসনায়। হাজারো বেজার হবার কথা থাকুক, বাজারে দরের উর্ধগতি চলুক তবু যদি তা মন্দ হয়—বলতে পারার মতো মন চাই যে, খারাপ যা তাকে খারাপ বলার এবং ভালো যা তাকে ভালো বলার।

আমরা সহৃদয় হৃদয়সংবাদী – কথাটাকে বড় বেশি বলি। আজকে আমাদের সহৃদয়তা থাক বা না থাক আমরা সংবেদনশীল হবার কথা ভাবি। এই জন্যে ভাবি যে, মানুষের মনের কাছাকাছি না যেতে পারলে তো আমাদের বক্তব্য বা ব্যাখ্যা কোনোটাই আর পাঠকের মনের মণিকোঠায় স্থান পাবে না। তাই সকল সময়েই চেষ্টা চলেছে কে কতটা মনের মতো করে পাঠকের মনোহারী হতে পারছেন। ফলে হচ্ছে কি সাধারণ মানুষের মনের মতো কথা বলা হচ্ছে কিন্তু মননশীলতা নিয়ে কথা বলা হচ্ছে না। সাধারণের মনোহারী হওয়ার ফলে নানারসের নানারূপের মনোহারী দোকানী হওয়া যাচ্ছে কিন্তু মানসিকতার সঞ্জীবনী রচনা করা যাচ্ছে না। সবাই মন জুগিয়ে বক্তব্য সাজাচ্ছেন বা ব্যাখ্যা করছেন এমন ভাবে যেন পাঠকের মনের কথা মনের মতো করে বলা হয়ে যায়। যে কথা বা যে ধারণা পূর্ব থেকেই বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে অথবা পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে আজকের অধিকাংশ আলোকপ্রাপ্ত মানুষের ধারণা করাটাই সম্ভব তাকেই ফলাও করে বলায় সুবিধা এই যে, যা অগণিত মানুষের মনের মধ্যে ওঠাপড়া করতো তাই তো তাঁরা লেখার ভাষা-শিল্পে পড়তে পেয়েছেন। পাঠক যেন আগে থেকেই লেখকের সহৃদয় হয়েই রয়েছেন। লেখকের বলার কথায় সংবেদনশীলতার সন্ধানে পাঠক আর অসুবিধা অনুভব করেন না। তখন সহজেই হয়ে যায় প্রবন্ধকারের বক্তব্যে পাঠক-ভাবনার প্রকৃষ্ট বন্ধন।

কিন্তু যে-কোনো প্রবন্ধের প্রকৃষ্ট বন্ধনের সঙ্গে এর কোনো জাতধর্ম মেলাতে গেলে মিল পাওয়া যাবে না। কারণ ধরতাইটা যেমন যাদু গল্প-বলিয়ে জানেন তেমনি প্রাবন্ধিককেও জানতে হয় বক্তব্যকে কেমন ভাবে সাজিয়ে দিলে সম্পূর্ণ অজানা বিষয়কেও পাঠকের অতিজানা বিষয়ে পরিণত করতে পারা যায়। জানেন কেমন করে অত্যন্ত দুরূহ সমস্যাকেও অতিসহজ সমাধানের পথে

উপনীত করতে পারা যায়। এবং এইখানে প্রবন্ধকার ঠিক পাঠকের সঙ্গের হয়েই তাঁর যত বক্তব্য স্থাপনা করবেন, যত মত ব্যক্ত করবেন।

আমাদের পুরাণে বা মহাকাব্যে যে বক্তব্য, আমাদের উপনিষদে বা ভাগবতে যে বিবরণ – তার মধ্যে এমন একটা সংহত সিদ্ধির পথনির্দেশ পদে পদে অভিব্যক্ত হয় যে তা আমাদের আজকের দিনেও কোথাও তার নড়চড় করা যাচ্ছে না। এমন দার্ঢ্য এবং দৃপ্ত বিষয় ও বিষয়ীর উপস্থাপনা হয়েছে যে তা প্রগাঢ় সংহত ভাবে ও ব্যঞ্জনায় সম্পূর্ণ এবং স্বতন্ত্র। সেই হিসেবে শাশ্বত বক্তব্যে অবিচলিত এবং নিবিড় যুক্তিজালে সমাকীর্ণ প্রাচীন মহৎ শাস্ত্রগুলি তো রচনাশৈলীর গুণে প্রকৃষ্ট বন্ধনেই বিকশিত। কিন্তু তাই বলে এইগুলি প্রবন্ধের পর্যায়ে কিন্তু আসে নি আধুনিককালেও।

এখানে তাই রচনারীতির দিকেও চাইতে হবে, শুধু বক্তব্যনীতি নিয়ে চললে বোধ হয় হবে না। গদ্যে গাঢ়ভাবে মতবন্ধনের রচনাকেই আধুনিক সাহিত্যের আঙিনায় যখন প্রবন্ধ বলা হল, তখন কিন্তু প্রাচীন প্রকৃষ্ট বন্ধনের সংজ্ঞাকে মনে রেখেই শব্দপ্রয়োগ যে হয়েছিল সে বিষয়ে কোনো ভুল নেই। এক্ষেত্রে আধুনিককালে কেবল গদ্যবন্ধ রূপটিই যা আমাদের প্রজ্ঞান অনুভূতিতে প্রবন্ধ কথাটি উচ্চারিত হলেই উচ্চকিত করে তোলে। আমরা গদ্যের শুষ্ক কাষ্ঠকে বক্তব্যে গেঁথে দেওয়াকে প্রবন্ধ বলি আর নিরস তরুবর গদ্য পল্লবিত হয় কাহিনীর ছোঁয়াচে, তখন উপন্যাস বা গল্পের সৃষ্টি।

এ কথাটা জানা কিন্তু তবু বলতে হল এখানে কারণ প্রবন্ধের বিষয় বলতে গিয়েও তো সেই প্রবন্ধই রচনা করতে হচ্ছে। অনেক জানা বিষয়কে জানাতেও হয় প্রবন্ধে বক্তব্যের সামগ্রিকতা পরিস্ফুটনের জন্যে। একেই বলা যায়, কথা বলতে গিয়ে কিছু কথা যেমন স্মৃতিরোমন্থনমূলক হয় – এও তেমনি। অনেকদিন আগে একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছে কিন্তু তেমনই ঘটনা যদি আবার ঘটে তা হলে কারো সঙ্গে কথা বলার সময় সেই পুরোনো ঘটনার স্মৃতিকথা স্বভাবতই সকল মানুষই বলে বসেন। এখানে হয়তো কেউ বলতেও পারেন যে, পুরোপুরি ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্ত ঘটে।

আমাদের জীবনচর্যা, লৌকিক বা নাগরিক, যেমনই হোক না কেন সব দিক নিয়েই আলোচনা চলে। তখন ইতিহাস ভূগোল নৃতত্ত্ব বিবর্তনবাদ ঐতিহ্যবাদ গণবাদ তন্ত্রমন্ত্র যৌক্তিক জ্ঞানের সব ক্ষেত্রেই প্রসঙ্গ-অপ্রসঙ্গ

প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে আসতে দেখা যায়। কিন্তু সময় সময় চম্‌কে যেতে হয় এই দেখে যে, মোদ্দা যে বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য তা চাপা থেকেই গিয়েছে এবং প্রাধান্ত পেয়ে গিয়েছে কোনো একটি বিশেষ মতবাদের ব্যাখ্যা ও বিবরণটি। একে 'ধান ভানতে শিবের গীত' গাওয়া বলতে চাইলে আপত্তি করার যুক্তি দেখি না। কোনো বিশেষ বাদকে প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়াকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে না কিন্তু তার সন্ধানে প্রকাশ হলে ঠিকই বাদ প্রতিবাদ হতে পারে তবু হাস্তকর প্রহসন হবে না।

এইখানে তো আমার মনে হচ্ছে প্রবন্ধে প্রবাদের প্রচুর ব্যবহার কোনো কোনো লেখকের প্রায় মুদ্রাদোষের মতো ঘাড়ে চেপে বসে থাকে। তাঁরা এমন ভাবে সব প্রবাদবাক্য উদ্ধার করে প্রবন্ধে বসিয়ে দেন যে বক্তব্যকে যেন ছাপিয়েই যাচ্ছে প্রবাদমালার প্রহেলিকা। তাই প্রবন্ধকার যথার্থ অভিনেতার মতোই নিজের অভিনীত চরিত্রের অনুযায়ী উচ্ছ্বাস প্রকাশ অবশ্যই করবেন কিন্তু অতিশয় অভিনয় (ওভার এক্টিং) যেন না করেন।

আর একটা কথা অকপটেই স্বীকার করা চলে যে, যে-কোনো প্রবন্ধ লেখকই মনে মনে ভাবেন যেন তিনিই সব কিছু বোঝেন অন্যে কিছুই বোঝেন না। ফলে তাঁরা একেবারে বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ থেকে আরম্ভ করেন যখনই যা কিছুই লিখতে বসেন। লেখেন পাতার পর পাতা অজস্র উদ্ধৃতি দিয়ে নিচে পাদটীকায় উদ্ধৃতির মূলগ্রন্থের নামটি স্পষ্ট করে উল্লেখ রাখেন। উল্লেখ রাখেন উক্ত গ্রন্থের কতসংখ্যক পৃষ্ঠায় মূলত এই উদ্ধৃতিটি মুদ্রিত আছে। শুধু তাই নয় আবার গ্রন্থের প্রকাশ কাল বা প্রকাশক বা কোন সংস্করণের গ্রন্থ থেকে আলোচ্য তাঁর প্রবন্ধে উক্ত উদ্ধৃতিটি মুদ্রিত হয়েছে। এবং এতে বোঝাতে চেয়েছেন যে তিনি সেই বিশেষ গ্রন্থের বিশেষ সংস্করণ থেকে সাধু বক্তব্যটিকে উদ্ধার করেছেন।

এই ভাবে অনেক সময় তাই দেখা যায় সাধু বক্তব্যে প্রবন্ধ ভারাক্রান্তই হয় বেশি এবং বেশ অনেকের ক্ষেত্রেই কিন্তু সেসব প্রবন্ধ সুস্বাদুও হয় না।

অবশ্য প্রবন্ধ মাত্রই যে সুস্বাদু হবে তেমন কোনো কথা নেই বরং আধুনিক-কালের সংজ্ঞায় গদ্যবদ্ধ প্রবন্ধ 'শুকং কাষ্ঠং' বললেই ঠিক বলা হবে। কারণ মননশীলতার মুনশীয়ানায় 'ললিতলবঙ্গলতা'র ভাষা একেবারেই ব্রাত্য বিশেষ। একটি ক্রপদী গাম্ভীর্য নিয়ে, বহু পঠনপাঠনের অনাবৃত অভিজ্ঞতার উচ্ছ্বাস দেখিয়ে অথবা যা কিছু দৃশ্যমান সব কিছুকেই 'এহবাহ্য' তুচ্ছাতীত তুচ্ছজ্ঞানে

হেয়ো প্রতিপন্ন করার মনোবৃত্তি অথবা বিদেশী লেখকের উদার উন্নত দৃষ্টিকে প্রতিষ্ঠা করে দেশের স্রষ্টার স্রষ্টাকে অসম্মানিত করার মতোও বিপুল মনোবল আধুনিক প্রাবন্ধিকের এই স্বাভাবিকতার লক্ষণ দেখলেও অবাক হবার মতো যেন মন আমাদের না হয়। আজ আমরা বিশ্বনাগরিক হতে চলেছি। বিজ্ঞানের কল্যাণে আজ পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তের মানুষ আমাদের নিকটজন, আমাদের আত্মার আত্মীয়। আমরা বিশ্বের সঙ্গে বিহার করছি। তাই আমাদের কাছে নিরপেক্ষ দৃষ্টি আর নির্ভেজাল দৃষ্টি একাকার হয়ে গিয়েছে। আমরা বিশেষ বক্তব্য বিশেষভাবে বলার মোহ নিয়ে মত্তপ্রায় হয়ে উঠেছি। আমরা নতুন কথা বলতে চাইছি সত্য কথা নয়।

সাধারণ পাঠক সচরাচর যে কথা পড়ে আসছে বা যে ভাব নিয়ে শিক্ষা দীক্ষা লাভ করেছে তার উল্টো কথার বা অন্য ভাবের আবহাওয়া পেলেই মনে করেছে একটা মননশীলতার ছোঁয়াচ লাগলো বুঝি। একটা বুদ্ধিদীপ্ত মানসিকতার অনুভূতিকে স্পর্শ করার আনন্দে বিপরীত মতামতকেই আঁকড়ে ধরে নিয়ে সেই ভাব-তরঙ্গে ভাসতে থাকেন। ভাবেন আধুনিকতম বুদ্ধিজীবীর মধ্যে যে বোধ ও বোধির জাগরণ এসেছে তা তাঁর মধ্যেও অনুরণন তুলছে, তিনিও যেন সেই ভাবেই ভাবিত। কিন্তু এই চমক লাগানো ভাবটিকে প্রাবন্ধিক নতুন কিছু বলার মোহেই যে বলেছেন তা কিন্তু পাঠক সাধারণের বোঝার মতো মানস অধিকার নেই। শুধুই আধুনিক চিন্তাধারাকে বুঝতে পারি এইটুকু জানিয়ে দিতেই যেন চরম তৃপ্ত ভাবেন। অনুভূতি ও উপলব্ধির মধ্যে যে উপনীত হতে হয় কোনো জিনিস গ্রহণ করার আগে সে বোধই এই সব চটুল রুচির পাঠকের মধ্যে দেখা যায় না। সেই বুঝেই প্রবন্ধকার যথার্থ গবেষণা না করে চমক লাগানো ভাবনাকেই অনুসন্ধান করতে থাকেন। বিশিষ্ট মনীষীদের জীবনযাত্রা, তাঁদের বান্ধবসংঘ বা সাহিত্যজীবন নিয়ে এমন সব মন্তব্য ও এমন ভাবে সেই সব ঘটনাকে উপস্থাপন করেন যে পাঠকের মনে হবে—ও বাবা এতো দেখছি রীতি মতো নাটক। জীবনের ঘটনা নিয়েই নাটক। তা সত্যি। কিন্তু জীবনীকে বিকৃত করে প্রবন্ধের বর্ণনায় নাটকীয়তা আনায় পাঠককে রোমাঞ্চিত করে তোলা যায় সত্যিসত্যিই কিন্তু জীবনীর মালমশলা নিয়ে যথার্থ প্রবন্ধের ধর্ম থেকে তিনি বিচ্যুতই হয়ে পড়েন। আজকের দিনে এমনি রম্যধারায় জীবনের কোনো কোনো ঘটনা নিয়ে রচনায় রেওয়াজ

প্রবন্ধভাবে প্রকাশিত হচ্ছে এবং তা ঠিক জনপ্রিয়তা লাভ করছে কিনা জানা নেই তবে প্রকৃষ্টরূপে বন্ধনটার যেন অভাব আত্মপ্রকাশ লাভ করছে।

আজ সার্থক প্রবন্ধ রচনার জন্যে যে শ্রমস্বীকার তা কেউ কেউ করছেন তখনই তাঁরা যখন পারিশ্রমিকের আশ্বাস কোনো পত্রিকার দপ্তরে পেয়ে যান। না হলে একটা দীর্ঘ সময়ের বা স্বল্প সময়ের পরিশ্রম করে যে প্রবন্ধটি লিখলেন একজন, তা যথোপযুক্ত মর্যাদা না পেলে তাতে মন কি ভরপুর হয়? আমাদের প্রবন্ধ লেখকরা অনেক ক্ষেত্রেই হয় পত্রিকার তাগিদে আর না হয় ছাত্রশিক্ষার তাগিদে প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করেন। তাই অনেক সময়েই এই সব প্রবন্ধে দেখা যায় বক্তব্য ও উপস্থাপনা বেশ মনে ধরার মতো কিন্তু বহুশ্রুত পুরনো জিনিসই নতুন ভাষায় বলা হয়েছে দেখা যাবেই। অবশ্য তার মধ্যে কখনো কখনো দুএকটা চমক লাগানো বিষয়ও প্রকাশ পেয়ে যায়। কিন্তু একটা যথার্থ গবেষণামূলক প্রবন্ধের রচনাকালে যে শ্রম স্বীকার করা প্রয়োজন তা খুবই কম লেখকের পক্ষেই সম্ভব হয়। একটা ভাসা-ভাসা ভাবের ফানুস উড়িয়ে মানুষ মনকে মাতিয়ে দিয়ে যেতে পারাই যে সব নয় তা কম লেখকই ভাবছেন। তাঁরা বহুজনের মনোরঞ্জনটাই আসল লাভ বলে ধরে নিয়েছেন কারণ জনচিত্ত জয়ই তাঁদের একমাত্র কাম্য।

হৃদয়তন্ত্রে মন্ত্রে মন্ত্রে অনুরণন তোলার অপর নাম কি সাহিত্য নয়? তা যদি না হবে তবে সহিত ভাব আসবে কেমন করে? এখানে জনচিত্ত জয়ী সৃষ্টির মধ্যেই তো তাই স্রষ্টার শ্রেষ্ঠত্ব। বর্তমান ভাবনার পরিমণ্ডলে হৃদয়ের চেয়ে মস্তিষ্কের, চিত্তের চেয়ে বৌদ্ধিকের, উপলব্ধির চেয়ে উপলক্ষের প্রাবল্যে ও প্রাধান্যে শুধু মননের দ্বারাই যাচাই চলে—সূক্ষ্ম-শুভ্র অনুভূতি ও অনুভব অনুভাবনা মাত্র হয়, অভিভাবনা হয় না। অতিবুদ্ধির অধিবাসে চিত্তের হয় নির্বাসন।

একজন যথার্থ প্রবন্ধকারের দুরকমের পরিশ্রম করতে হয়। এক তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করা, দুই তাকে ভাবানুভূতির অনুকূলে ভাষায় মনোহারী করা।

হ্যাঁ। এই মনোহারী করার কথাতেই বলতে পারা যায় যে, প্রবন্ধকার তথ্যকে ও তত্ত্বকে শুধু গণিতশাস্ত্রের সংজ্ঞানির্দেশক তালিকার মতো কালির আঁচড়ে ধরে দিয়েই কর্তব্য সম্পন্ন করেন না। প্রবন্ধ রচনা করতে গিয়ে তাই নানারূপের কথায় কথায় গোড়ে মালা গড়তেই দেখা যায় যিনি যথার্থ প্রাবন্ধিক, তাঁকে। আমাদের কাছে মনের এমন একটা অবস্থা এসে যায় সময় সময় যে

যখন খুব সহজ জিনিসটাও সহজে যেন ধরতে পারি না। কিছুতেই আর মনটা ঠিক করে নিতে পারি না যে এই কাজটা করা যায়, কি না যায়। তখন বোঝাবোঝা ভাব নিয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যেটা খারাপ দিক সেই দিকেই মনের দৌড় দেওয়া আগ্রহের হয়। ভালোর চেয়ে খারাপের দিকটাই যেন হাতছানি দেয়।

এখানে বলতে পারা যায় যে, যখন মন কোনো একটা গভীর সমস্যার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে দিশেহারা হতে চলেছে তখন সেই ডুবন্ত মানুষের খড়কুটো পাওয়ার উপমাটা স্বভাবতই মনে আসছে। কিন্তু এখানে আমরা মনের সেই ডুবন্ত অবস্থায় খড়কুটো নয় যেন আশ্রয় দ্বীপই পেয়ে যাই যখন কোনো ধর্ম বা দর্শনের প্রবন্ধ পাঠের সুযোগ পাই।

কথাটা এত সহজে বলা হয়ে গেলেই আসলে কিন্তু এত সরল কথা এটা নয়। তার কারণ প্রতিটি মানুষের মনের তন্ত্রী প্রতিটি ক্ষণেই তো ভিন্ন সুরে বাঁধা থাকবে এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সমস্যায় মনের ভারসাম্য বিভিন্ন অবস্থায় থাকবে। এ ক্ষেত্রে ধর্ম বা দর্শনের ঠিক কোন প্রবন্ধটি পাঠের পর মনের আবহাওয়া অনুকূল পরিবেশ রচিত করবে তার প্রাপ্তিযোগ ঘটা বিশেষ প্রয়োজন। এটা সম্ভব হয় যদি খুব পঠনপাঠনে একাগ্র ব্যক্তি হন তাঁর পক্ষে অথবা মনের আর কোনো অবকাশ নেই শুধু পাঠেই অবসরের নিযুক্তি ঘটাতে পারা যায় তা হলেই সম্ভব। কারণ তখন মনের ধারায় আনুকূল্য দান করার মতো বক্তব্যে উপনীত হবার সুযোগ এসে যাবেই বহু পঠনের ফলশ্রুতি হিসেবে।

এইখানে প্রবন্ধপাঠ মনের কাছে একজন সৎবন্ধু বা দিশেহারা মনের কাছে সৎ-উপদেশক রূপে প্রতিভাত হয়ে উঠবে। আমরা বিপদে মধুসূদন কথাটা বলি, এখানে কতকটা যেন প্রায় তেমনিই হতে পারে। একটা সুন্দর বাণীযুক্ত গান শোনার পর মন যেমন সুস্নাত হয়ে উঠতে পারে এও প্রায় তারই মতো হতে পারে না কি?

অবশ্য এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো যে, পাঠক যদি সত্তি-সত্তিই পড়ুয়া হন তবেই সম্ভব, না হলে হাজার মন খারাপী লোক হাটে মাঠে ঘুরছেন তাঁদের কথা এখানে ধর্তব্যের মধ্যেই আনা চলে না। কারণ আমাদের দেশের এমন অনেক শিক্ষিত লোকই রয়েছেন যাঁদের প্রবন্ধপাঠ করতে গেলেই দুএক পৃষ্ঠা পড়ার পরই তাঁদের মাথা ঝিমঝিম করে, চোখে ধোঁয়া দেখতে শুরু করেন এবং গরমী কালের সময় হলে মাথার ওপরে

বৈদ্যুতিক পাখাটাকে জোরসে ঘুরিয়ে দিয়ে আরাম কেদারায় ক্লান্ত দেহে এলিয়ে পড়েন।

ভাষার বুনটে কোনো বক্তব্য বিষয় তাই প্রকাশ করার কথা সব ভাষার সাহিত্যেরই প্রধান পাথেয়। কারণ কথা তো অনর্গল মানুষ তার স্বভাব ধর্মে বলেই চলেছে। অনেকে বলেন এই সব বক্তব্যবাগিশদের বক্তিয়ার খিলজি, অর্থাৎ মৌলভাবে বোঝাতে চান যে, লোকটি বাচাল।

কিন্তু এই বাচাল লোক যে নাচাল নয় তার প্রমাণ রাখেন প্রাবন্ধিকরা। পাতার পর পাতায় কত যে বাচালতা চলতে পারে তার ভুরি ভুরি প্রমাণ হামেশাই সহৃদয় পাঠক-সমাজ পাচ্ছেন। কোনো কিছু বলার নেই অথচ বলছেন তো বলছেনই। কোথায় যে আরম্ভ করেছেন আর কোথায় যে শেষ করলেন তার যেন খেই পাওয়াই দায়। এমন লেখা সাহিত্যের জারক রসে এমন রসালো হয়ে উঠেছে যে তা কিন্তু ছেড়ে রেখে অন্য কথা আর ভাবাও না যেতে পারে। কিন্তু কথার পিঠে কথা গেঁথে বাচালতাটা:প্রবন্ধকারের অনেক ক্ষেত্রেই একচেটিয়া যেন অধিকার না হয়ে যায়। এই আশঙ্কাতেই শুধু স্বল্প কথায় সহজ করে সরল যুক্তিতে প্রবন্ধের বুনট কেউ কেউ আদর্শ স্থানীয় বলেই মনে করেছেন। তাঁরা সব সময় ভাবাভঙ্গি উপমা-অলঙ্কার সব কিছুর মধ্যেই একটা সহজবোধ্য সরলতা ও স্পষ্টতাকে প্রবন্ধে প্রার্থিত জ্ঞান করে থাকেন। ঋজু বক্তব্যকেই প্রাবন্ধিকের হাতিয়ার বলতে থাকেন। সোজাসুজি পাঠকের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হওয়াই যেন অনুসরণীয়।

আধুনিক বৌদ্ধিকবৃত্তির মানসিকতা বিষয়ে ভাবতে গেলে দেখা যায় ব্যক্তি চিন্তাই সমষ্টির চিত্তে অনুপ্রবিষ্ট করানোর আপ্রাণ প্রচেষ্টা। সেখানে বিশেষ বিশেষ মতবাদী ভাবধারার অথবা মতলববাজি ভাবনার সূক্ষ্মধারার স্রোত প্রবাহের প্রভাব। যেন উচ্চমঞ্চের আদর্শবাদী ভাষণের যন্ত্রমুখী উচ্চকণ্ঠের তূর্যনিনাদ। যেন নিশ্চিত পথের পাথেয় নির্দেশী ঘোষণা। অথচ জনচিত্ত কি মনের দৌড়ে মুক্তির দিগন্ত সন্ধানী মানসিকতার অধিকারী হতে পারছে?

অথচ প্রাচীন আলঙ্কারিক মতে একটি ধ্বনিবাদী যুক্তিও তো রয়েছে যেখানে বলা হচ্ছে বাচ্যার্থ বিষয়ের উর্ধ্বে একটা অভিব্যক্তির অনাস্বাদিত ব্যঞ্জনার সুরভির দিক। যা বলা হল তাকে ছাপিয়ে আরো আরো অনেক অনেক দূরের কথায় মন ছুটে যাবে। যা যা বলা হল তাতো হলই কিন্তু তার

পরন্তু এমন ভাবের আবহাওয়া সৃষ্টি হল যা জ্ঞানের বিষয় বস্তু হয়েও প্রজ্ঞায় প্রস্তোদিত হবে।

আমাদের আধুনিক চিত্রচর্চা যাঁরা করেন তাঁরা এই মনের ভাব বা অনুভাবকে বোঝাতে গিয়ে যদি চিত্র রচনা করতেন তা হলে মনে হয় তাঁরা একটি আলোর বিচ্ছুরণের কাছে একটি মানুষকে দাঁড় করিয়ে রেখে ঠিক সেই মানুষটিকেই দেখাতেন অনেক দূরে ছায়া হয়ে যেন চলে যাচ্ছেন। আসল কায়া ছেড়ে তাঁর যেন ছায়া হয়ে উধাও যাত্রা মানস-অনুভূতির অনুরণনে।

তাৎক্ষণিক এবং শাশ্বতিক সব চিন্তনই বক্তব্যে ও বিচারবোধে নানা ভাবনার কোরকগুলিকে বিকশিত হবার অবকাশ দেয়। তখন প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে স্বার্থ-স্বার্থশূন্য চেতনার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হবে প্রতিদিনের জীবন ও জীবিকার কথা এবং সমস্যা ও সমাধানের পথ-নির্দেশপূর্ণ অভিব্যক্তি অভূতপূর্ব আলোড়ন তুললেও যথার্থ অভিরুচির সার্থক আয়োজন সাহিত্য মূল্যে হবে কি ?

আসলে মৌল বক্তব্যে এসে উপনীত হতে হবে আমাদের সেই বিশেষ কোনো ভাব ও ভাবনার আশা ও আশ্বাসের বিন্দুতে। কিন্তু বিন্দুতেই যেন পাঠক লাভ করতে পারেন সিন্ধুর স্বাদ (যা অনেকক্ষেত্রেই অভাবনীয়)।

কিছু প্রাজ্ঞপুরুষ পড়েছেন অনেক কিন্তু সে তুলনায় লিখেছেন সামান্যই। তাঁদের প্রজ্ঞান চৈতন্যে নব নব জ্ঞানের দিগন্ত আবিষ্কারে যেন তাঁরা নিজেদের আলোকিত করেছেন যতখানি ঠিক সেই অনুপাতে অন্যের অন্ধকার দূর করার অধিকার থাকা সত্ত্বেও প্রবন্ধদীপিকা প্রজ্জলিত করেন নি। তাই অনেক গভীর আধ্যাত্মিক সাধনমার্গের বিভিন্ন বিষয়ের গূঢ়তম সমস্যার অথবা দেশবিদেশের ভাষাবিজ্ঞানের তুলনামূলক আলোচনার বিস্তৃত ক্ষেত্র যথার্থভাবে অনাস্বাদিতই রয়েছে। পাঠককুল সূত্র ধরে সূত্রান্তরে যেতে চান সব বিষয়ের সব ক্ষেত্রে তাই পণ্ডিতজনের পথনির্দেশ প্রার্থিত থাকে সর্বদাই। অথচ সেই পণ্ডিত-মনীষার অবদান আশানুরূপ হয় না।

তাঁরা মনে করেন পড়ার পরিমাপ থাকবে না কিন্তু লেখার ক্ষেত্রে থাকবে। যা পড়ার মতো তা অবশ্যই পড়বেন। মনে হলে বারবার পড়বেন। রসাস্বাদন করে বুঁদ হয়ে যেন মাতাল হয়ে যাবেন কিন্তু চাতালে বসে লেখায় চঞ্চল হবেন না। ফলে প্রবন্ধ যে জ্ঞান রাজ্যের প্রধান প্রবেশ পথ তা সর্বতোভাবে ধনধান্যে পুষ্পভরা হয়ে তেমন ভাবে আর উঠলো না। আক্ষেপ করে কেউ যদি এই সব

প্রাজ্ঞজনদের মাথায় কৃপণতার অপবাদ চাপিয়ে দিয়ে থাকেন তাতে আমরা কি খুব অবাক হবো? আমরা কি আর বলতে পারবো যে পড়েছেন তাঁরা ঢের যথেষ্ট নাই-বা লিখে রেখে দিলেন উত্তরকালের জন্যে! বরং তার উল্টোটাই মুখ ফোসকে বলা হয়ে যাবে না কি?

আক্ষেপ করে অপেক্ষা করা যায় কিন্তু জীবনটা সংক্ষেপের তাই যা পাওয়া যায় তাই পড়া—উপদেশটা মন্দ নয়।

কিন্তু আশ্চর্য লাগে তখনই যখন তাঁদের মহৎ প্রতিভার বৃহৎ অবদানের দিকে উত্তরকালের মানুষ ফিরে তাকাতে চাইবেন। তাঁরা কি পাবেন? তাঁরা মনীষী-মানসের পরিচয় পাবেন যা কালির আঁচড়ে ধরা আছে—বাস, তার বেশি কি? হয় তো তাঁদের স্মৃতিচারণা করে অনুরাগীজনের লেখার স্মরণিকা পাঠে কিছু কিছু অলেখা আলেখ্য বা তথ্য ও তত্ত্ব সেই প্রাজ্ঞপুরুষের বিষয়ে জানা যেতে পারে, এইটুকুই। না হলে বাংলার প্রবন্ধসাহিত্য আরো আরো অনেকগুণ বেশি উচ্চাঙ্গের এবং উত্তুঙ্গের হতে পারতো।

তবে এখানে হয় তো কারো কারো মনে আসতে পারে যে, যা হয়েছে তাই-বা এমন কি অনাদরের!

অবশ্যই এমন প্রশ্ন জাগতে পারে। কিন্তু আমাদের আপশোষ এইখানেই হয় যে, যত মহৎ মানুষ বৃহৎ মনীষা নিয়ে এসেছেন ঠিক সেই পরিমাণে তাঁরা তাঁদের প্রজ্ঞালোকিত চৈতন্যের প্রদ্যোদিত চেতনাকে যথাযথভাবে উত্তরকালের সম্পদ করে গিয়েছেন কি-না সেটাই সন্দেহ।

তবে এই সন্দেহ শব্দটাই যেন সত্যি হয় আমার।

লেখকের লেখা কি ভাবে হয়? কথাটা খুবই গোলমেলে ধরনের হল। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে দেখা যাবে যে প্রত্যেক লেখার পেছনেই একটা তাগিদ থাকে। এই তাগিদ বললেই মনে হবে লেখকের মনের অনুভূতি নির্বাসিত সুরভি। কিন্তু সব সময় সেটাই সব নয় আবার সেটা যে একেবারে কিছু নয় তাও নয়। কারণ যদি লেখকের লেখার বিষয়টির প্রতি প্রগাঢ় অনুভূতির মধ্যে দিয়ে উচ্ছ্বাস না আসে তা হলে কোনো একটা সাহিত্যমূল্যের মর্যাদা পাবার মতো রচনা কি হবে? এখানে উচ্ছ্বাসই বলছি কারণ এই শব্দেই বোধ হয় ভাবের অভিব্যক্তিকে ঠিক মতো ফোটানোর কথাটা বোঝানো যাবে। এখানে উচ্ছ্বাস বলতে কাব্যের বাহুল্যের দিকটা অবশ্যই ধরা যাবে না। শুধু লেখক লিখছেন কেমন করে তাই বলা চলে। তিনি তাগিদ পান সত্যিকারের

প্রাণের প্রেরণায় যেমন তেমনি সহজচোখে দেখা যায় কোনো পত্রিকার সম্পাদকের কাছ থেকেও যে তাগিদ পেয়ে থাকেন তার ফলেই কালির আঁচড় টানতে অতি অলসেরও অনেক সময় বাধ্য হতে হয়।

সম্মানিত লেখকরা সব সময়েই তো সম্মানিতভাবে জীবনচর্চায় পদচারণা করতে চাইবেন। কিন্তু মননশীল লেখকরা বিশেষ করে যদি আত্মসম্মানী হয়ে বসে থাকেন তা হলে কদাচিৎ লেখার তাগিদ পান এবং যদি তাঁর অনুরাগীর দল বিভিন্ন সম্পাদকের দপ্তরে তাঁর হয়ে তাঁবেদারি না করেন তা হলে কোনো ভরসা থাকে না স্রষ্টার সৃজনশীলতার। অথচ মননশীল মানসিকতা তো সম্মানবোধের চৈতন্যে স্থিতধী হয়ে অনর্গল আত্মস্থ থাকবেনই।

যথার্থভাবে দেখতে গেলে দেখা যাবে যে কিছু গোষ্ঠীগত মন নিয়ে পত্রিকা সম্পাদনার কাজ এগিয়ে গেলে তখন গুণীজ্ঞানী লেখকরা অবহেলিত হতে থাকেন অথবা বলা যায় নিজস্ব গোষ্ঠীগত মানুষদেরই রচনাপ্রকাশে পত্রিকা সম্পাদকদের আগ্রহ বেশি হয় এবং উচ্চস্তরের লেখকরা আপন সম্মান জ্ঞান নিয়ে থাকেন, ফলে তাঁদের সৃষ্টির রসাস্বাদনে পাঠককুল হয় বঞ্চিত।

তাগিদ জিনিসটা লেখকের খুবই প্রয়োজনীয়। লেখা দিতে হবে, লেখার জন্যে সম্পাদকীয় দপ্তরের তাগিদ আসছে—একটা যেন স্বাভাবিক প্রেরণাতেই লেখক লেখায় ডুব দিতে চাইবেন। প্রবন্ধকাররা যদি সম্পাদকের যথাযোগ্য তাগিদ পেতে থাকেন তা হলে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য আবার নতুন দিগন্তের দিশারী হয় তো হতে পারবে।

কিন্তু তবু আপশোষ থেকেই যাবে এই ভেবে যে, কত মহৎমনীষা নিয়ে প্রাজ্ঞপুরুষরা এসেছিলেন, আবার চলেগিয়েছেন ; শুধু কথা হয়ে আছে, স্থায়ী সম্পদ হল না তাঁদের জ্ঞানের প্রজ্ঞাধারা। তাঁরা লিখলেন না নিজেদের জ্ঞানের দিগন্ত বিস্তারী মনীষার সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ ঘটিয়ে, তাঁরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেন নি উপলব্ধি ও উৎক্রান্তি। যে নদীতে প্রচুর মাছ আছে—সে তো সম্পদশালী। কিন্তু সেই সম্পদ আহরণ করতে হয় আহরণকারীকে জাল বিছিয়ে।

তাই লেখক শুধু লিখে চলেন দুটো তাগিদে—এক তাঁর অন্তরের অনুভবে, দুই পত্রিকা সম্পাদকের আগ্রহের আমন্ত্রণে।

প্রবন্ধকারের ক্ষেত্রে এ বিষয়টা আরো মুখ্যভূমিকা গ্রহণ করে। কারণ এখন চটুল ও রসাল সাহিত্যের বাজারদর সমধিক। চাহিদা সেই জন্যে সরলসাহিত্যের, যে সাহিত্য সর্বস্তরের জনমানসের সহজ বোধের জগৎকে স্পর্শ

করছে। তাই প্রবন্ধকার লেখার সুযোগ পান সীমিতগণ্ডির মধ্যে। তাঁদের লিখে ফেলে রাখতে হয় কি না ঠিক জানা নেই তবে লেখার জন্যে সম্পাদকের তাগিদ থাকলে যেন সোনায় সোহাগা।

যে-কোনো ভাষায় রচনা নানা ধরনের লেখা হয়ে থাকে, নানা বিষয়ের লেখা হয়ে থাকে কিন্তু প্রবন্ধ বলতে যে প্রকৃষ্ট বন্ধনের বাঁধুনির ঝাঁজ আসে তা কিন্তু সবসময় সবরচনায় আশা করা যায় না। তাই রচনা আর প্রবন্ধকে কোনো কোনো আচার্য ব্যক্তি পৃথক বলতে চেয়েছেন। কথাটা ভালোই লেগেছে সাহিত্যসমাজে তাই বোধ হয় রম্যরচনা লেখা বহুল প্রচারের ফলে জনপ্রিয় সাহিত্য মাধ্যমে পর্যবসিত হয়ে উঠেছে। স্মৃতিকথা বা ইতিহাসের ঘটনা নিয়েও রচনা লেখা যায় আবার বিজ্ঞানের বা শিল্পায়নের কথা আলোচনা করেও রচনা লেখা যায়। আসলে বিষয় এখানে প্রধান নয় বিষয়ী যিনি তাঁর বক্তব্যকে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার্য রেখে তা পাঠকের দরবারে কেমন ভাবে এবং কতখানি স্বয়ংসম্পূর্ণতা নিয়ে উপস্থাপনা হচ্ছে তারই ওপর নির্ভর করবে প্রবন্ধের সীমানায় তা আসছে কি আসছে না। রচনার বিষয় হতে পারে একদিনের একটা সামান্য ঘটনা নিয়ে মনের যে তোলপাড় করা ভাব তার অভিব্যক্তিতে কিন্তু একটা অভিজ্ঞতাই প্রবন্ধের সব নয় যদিও প্রাবন্ধিকের বেশ অভিজ্ঞতা থাকা চাই যে কোনো বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে হলে। আবার কেউ হয়তো দুটো প্রচলিত কথার ওপরে একটা রচনাই লিখে ফেললেন যেমন—মৃত্যু ইচ্ছা এবং ইচ্ছা মৃত্যু নিয়ে ধরা যাক। কিন্তু এটা যদি প্রবন্ধের বিষয় করতে হয় তবে শাস্ত্রের মৃত্যুমূলক ধারনাকে নিয়ে অনেক তত্ত্বকথা বলতে হবে এবং একটা তথ্যপূর্ণ বক্তব্যে প্রাজ্ঞতার পরিচয় দিতে হবে। অথচ রচনা লিখে দিলে রসিকতায় ভরে উঠবে আর সরস ভাবে পাঠককেও তৃপ্তি দেবে। আমাদের রেলগাড়ির অনেক অভিজ্ঞতা আছে বা প্রতিদিনের জীবনযাত্রা নিয়ে অনেক অভিজ্ঞতা হচ্ছে – তা নিয়ে রচনা সরসভঙ্গিতে লেখা হয়। আবার তার মধ্যে দিয়ে যে নাগরিক সমাজের জীবনধারণের বিপুল সমস্যা জাগছে এবং তার সমাধান কি তা যদি বলে বলে দীর্ঘ লেখায় হাত কেউ দিলেন, তা হয়ে গেল হয় তো প্রবন্ধই।

এইখানে মনে আসছে আজকের প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় সব থেকে জনপ্রিয় গদ্য রচনার মাধ্যম দৈনিক সংবাদপত্রের কথা। প্রতিদিন ভোরের সংবাদপত্র পাঠ করা একটা সভ্যসমাজের নেশা তাই অনেক লেখকেরই পেশা হয়েছে

সাংবাদিকতা। তাঁরা সংবাদসাহিত্যকে উজ্জীবিত করছেন তাঁদের রচনার দ্বারা কারণ জীবনের এমন কোনো দিক নেই যা নিয়ে সংবাদসাহিত্য না লেখা হতে পারে। সব সময় তা হয় তো প্রবন্ধের পর্যায়ে নাও ধর্তব্য হতে পারে তবু কর্তব্যরত সংবাদপত্রসেবীরা ভ্রমণ, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ধর্ম, দর্শন, বাণিজ্য, কৃষি, জীবনী, ইতিহাস, সংস্কৃতি, সংগীত, নাটক, যাত্রা, সিনেমা খেলাধূলো—কি নয়? এমন কি সাহিত্যের সব বিভাগ এবং পুস্তক পর্যালোচনা থেকে আরম্ভ করে ভাগ্যগণনা পর্যন্ত।

সংবাদপত্রের মধ্যে প্রবন্ধ অনেক ধারায় ও ধরনের ছোট ছোট আকারে প্রকাশিত হয়ে যাচ্ছে, তার মধ্যে সবগুলিই যে সাময়িকতার ঢেউ হয়ে মহাকালের তটে বিলীন হয়ে যাচ্ছে তা নয়, তার সঙ্গে কিছু ঝিনুক চকচক করতেও থাকে যা চিরকালের। সাহিত্যিকের লেখনীতে নিরস সংবাদ সরস হয়ে উঠছে, নিছক খবর গালগল্প হয়ে উঠছে। আবারো অনেক রচনা এমনভাবে প্রকাশ পায় যা পড়লে পাঠককুল চমকে অভিভূত হয়ে যায়। মনকে স্পর্শ করে সাধারণ ঘটনা অসাধারণ বর্ণনার সামান্য ছোঁয়াতেই। অসামান্য না হলেও অনেক ধারার বক্তব্যও পাঠকসমাজের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সহজেই সংবাদপত্র জনমত গঠনের সহায়ক হয়ে উঠেছে তাই রাজনৈতিক দলের সংবাদপত্র প্রকাশ নিজস্ব কর্মসূচীর অন্যতম। তাই সংবাদপত্র প্রবন্ধের বড় মাধ্যম আধুনিক সমাজে এবং অনেক ভালো ভালো সম্পাদকীয়ও লেখা হয়ে থাকে প্রতিদিন। এই সংবাদপত্রের কথা নিয়ে এক বিশিষ্ট ব্যক্তির বৈঠকে আলোচনা চলছিল তিনি কথাপ্রসঙ্গে বললেন একটি ইংরেজি কবিতার ভাবার্থ। সেটি এই যে, একজন বাঘ শিকারের জন্যে যাত্রা করলেন কিন্তু দেখা গেল বাঘের শিকার হয়েই তিনি ফিরছেন। কথাটা তিনি বললেন এই সূত্রে যে এক'দিন সংবাদপত্রকে গ্রাস করতে সাহিত্যিকরা ছুটে ছিলেন কিন্তু পরে দেখা গেল যে সাহিত্যিকদেরই সংবাদপত্র গ্রাস করে ফেলেছে। মনে হল ভারী তাৎপর্যপূর্ণ কথাটা।

যাঁরা সংবাদসাহিত্য রচনা করছেন বা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রবন্ধ লিখছেন তাঁদের যথার্থ সাহিত্যবোধকে এবং সাহিত্যিক বিচারধারাকে নিরপেক্ষ ও নীতিযুক্ত দেখতে চাওয়া প্রাজ্ঞজনের প্রজ্ঞাপ্রসূত কথা কিন্তু তাঁদের যে বৈভব ও বিভূতি নিয়ে ভাবকগোষ্ঠী রচিত হয়ে ওঠে তার বাইরের বৃহৎ পরিমণ্ডল অবহেলিতই থেকে যায়। চাটুকারদের তালুকথানায় কৃপাবর্ষণ প্রাধান্য পায় তখন,

যথার্থ সাহিত্যবোধ আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সাধারণ পাঠককুল সাধারণত বিচার করে না ভালোমন্দয়, পরের মুখে ঝাল খেতেই অভ্যস্ত। অমুক বইয়ের চাঙাও আলোচনা বেরিয়েছে, বাস আর দেখে কে। কেনো কেনো—হৈ হৈ করে পড়া হতে লাগল, গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারে কেনার দাবি আসতে লাগলো। বইটি না পড়লেই নয়! দেখতে দেখতে বাজার চলতি হল বইটি। লেখকের হল নাম প্রকাশকের ঘরে গেল দাম।

কিছু সমালোচক আছেন যাঁরা সাহিত্য বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে থাকেন এইসব সংবাদপত্রের প্রিয় লেখকদের নিয়ে। তাঁরা সাহিত্যবোধ্যার পরিচিতি চান কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে স্বল্প পরিচিতি নিয়ে পরিশ্রম করে যেসব বই বা যেসব লেখা ছোটো ছোটো কাগজে প্রকাশিত হচ্ছে তা আর দেখেন না, ফলে তাঁদের লেখায় শুধু বাজার-চলতি দু-পাঁচটি কাগজের দিকে মুখ চেয়েই সাহিত্য সমালোচনায় হাত পাকাতে হয়। যদি কেউ বলেন তাঁরা বিচারক হন না প্রতারক হন হয়তো ভুল বলা হবে না। কারণ পাঠকরা প্রায়ই প্রতারিত হয়ে যাচ্ছেন এইসব সমালোচকদের সমালোচনা পাঠ করে। শুধু গুটিকতক নামের মধ্যে ঘূর্ণিপাক খাচ্ছেন কিন্তু জানেন না দুর্বিপাকে ফেলবেন তাঁদেরকেই আগামীকালের যথার্থ সমালোচকশ্রেণীই। ছাই চাপা আগুনকে ঠিকই খুঁজে দেবেন নতুনকালের নতুন নতুন যথার্থ সাহিত্যবিচারকগণ। কেবল মাত্র কৃপালাভের আশাই যখন সমালোচকের ভূমিকা হয় তখন আর যাচাই হয় না বাছাই হয়। অর্থাৎ কার কথা বলবো আর কার কথা বলবো না—এই বিচারের বাছাইখানা হয়। সেটা আড্ডাখানার আওতায় আসে কিন্তু প্রজ্ঞাশালায় পাথেয় বলে গণ্যের সামগ্রী হয় কি? একটা নির্ভেজাল উদার মানসিকতা নিয়েই তো সাহিত্যবিচারকের বিচারবোধ বিধৃত হবে, একটা আলিঙ্গন করার বিরাট বক্ষপট নিয়েই তো হবে আচার্যের আচরণ। এবং সেই আচরণের স্বচ্ছ-মধুর বসন্ত বাতাসেই আকৃষ্ট হবে স্রষ্টাকুলের শ্রদ্ধা। যথার্থ আচার্যের আসনটি তো তাই চিরকাল প্রাবন্ধিকরাই লাভ করতে পারেন।

প্রবন্ধসাহিত্য এমন একটা সূক্ষ্ম সীমায় বিচরণ করে সৃষ্টি হয় যে, তা যে কোনো মুহূর্তে মহৎ উত্তুঙ্গেও উঠে যেতে পারে আবার ধূলিধরনীতেও লুণ্ঠিত হবার মতোও হতে পারে। কারো জীবনী বা পুরোনো শহর বা কোনো অঞ্চলের বিষয়ে লেখার সময় যে সতর্কতা এবং বিচারবোধ, যে ইতিহাসনিষ্ঠা এবং সমাজ সংস্কৃতি বিষয়ে সচেতনতা থাকা প্রয়োজন তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে না হলেও কোনো ক্ষেত্রে দৃষ্টিকটুভাবে লেখকের উদার মনোভঙ্গির অভাব সূচিত

করেছে। তাই প্রতি প্রাবন্ধিকেরই দায়িত্ব জ্ঞান, বিচারবোধ, নিরপেক্ষ দৃষ্টি, কোনো উদ্দেশ্যমূলক ব্যবসায়িক সমালোচকদায়া আচ্ছন্ন না হওয়া এবং অনুসন্ধান করে নতুন নতুন স্রষ্টার প্রতিভাকে পাঠকসমাজের কাছে তুলে ধরবার মতো বলিষ্ঠ মন থাকা একান্ত প্রয়োজন।

দায়িত্ব জ্ঞান বলতে বোঝানো হচ্ছে যে, তাঁরা যেন শুধুই প্রশংসা করে না যান বা গায়ে পড়ে কোনো লেখককে হেয়ো না করেন, যতটা বলার মতো বা যেটুকু খারাপ যেন তা না বললেই নয়, শুধু সেটুকুই বলেন। তাই যথেষ্ট নয় কি? বিচারবোধ তাই এখানে প্রয়োজন। কি বলবো এবং কতটা বলবো এবং বলবো যা তা যেন নিজের বিবেককে সজাগ রেখেই বলি। তাই নিরপেক্ষ দৃষ্টির কথা বলা যাচ্ছে, যা সমালোচকের কাছ থেকে প্রার্থিত। সাধারণত সাহিত্যসমালোচনার ক্ষেত্রে বড় প্রতিষ্ঠানের বা প্রভাবশালী লেখকের দিকে দৃষ্টি রেখেই আলোচনায় আলোককে ভালোমন্দের মানদণ্ডে কমবেশি করা হলে বেদনার কারণ ঘটায়। আর যদি আলোচনা শুধু পূর্ববর্তী কোনো আলোচককেই অনুসরণ করে তা হলে নিজস্ব হলো কি? একজন পরীক্ষার্থীর খাতার প্রশ্নোত্তরের সামিল হয়ে যায় না কি সেই সব প্রবন্ধ? খুব ভালো করে রচনা বইয়ের মুখস্ত করা বিদ্যা আওড়ে পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার মতোই হবে যে, এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই কি আমরা ভাববো না? তাই বিজ্ঞানের নতুন প্রতিভা-আবিষ্কার সরকারী দপ্তরখানার বদান্যতায় হয় কিন্তু সাহিত্যের নতুন প্রতিভা আবিষ্কৃত হতে পারে যথার্থ গুণী প্রাবন্ধিকেরই দরবারী দরাজখানায়।

মননশীল প্রাবন্ধিক হওয়া মানেই যদি হয় মানহানিকর প্রবন্ধকার হওয়া তা হলে সে রকম মননশীলতা ঠিক হাততালি পাওয়া কোনো বিদূষক জাতীয় ক্রীড়ামাত্র হয়ে যায় না কি? একজন সার্কাসের ক্লাউন আর শিক্ষাজগতের আচার্য সমান নয় নিশ্চয়ই? তাই সাহিত্যের অন্য কোনো বিভাগে যা কিছুই একটা না একটা কথা বলা গেলেও প্রবন্ধকারের দায় ও দায়িত্ব কিন্তু বড়ই সুস্পষ্টভাবে বিধৃত। কালতু কথায় আলতুবড়ি ফোটানোর ক্ষেত্র নয় এটা। কথার ফানুসে মানুষের মন খুশি হতে পারে কিন্তু সুখী হয় না প্রজ্ঞার প্রাজভাব। পরিচ্ছন্ন ও নির্ভেজাল রসবোধই রসিকের রাজপথ। তাই অসংখ্য বন্ধন মাঝে কবিদার্শনিক যখন চাইছেন মুক্তির অমৃতস্বাদ তখন প্রাবন্ধিকের জন্যে থাকছে প্রকৃষ্টরূপে বন্ধনই।

ঊনবিংশ শতাব্দী ও রবীন্দ্রনাথ

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতির আলোকে রবীন্দ্রনাথকে অবলোকন বা রবীন্দ্র-দর্শনের মহৎ উপলব্ধি যেন আমাদের উত্তরাধিকার স্বীকৃতিরই এক যথার্থ পরিণতি। তবু যে পটভূমিকায়, যে প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্র-মানসচৈতন্য আপন দিগন্ত লাভ করে আপন-খুশির আনন্দ-চেতনায় উদ্বোধিত হয়—তার প্রভাব ও প্রসাদ তার বিস্তৃতি ও বিশ্বাস যেন অবশ্যই উদ্ভাসিত বিগত শতাব্দীরই পূর্ণকুম্ভ।

রাজা রামমোহন রায় বা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বা ডিরোজিও, কেশবচন্দ্র সেন বা স্বামী বিবেকানন্দ—এক মহান মনন ও মহৎমনীষা নিয়ে, এক উন্নত ও উদার আদর্শ নিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষীয় সমাজ ও মানুষকে কলঙ্কশূন্য করেছিলেন; জীবনের নবীন ঊষার আলোকের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে বলেছিলেন। সে দৃষ্টির পশ্চাতে ছিল পাশ্চাত্যের প্রজ্ঞানের সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্য স্বীকৃতি এবং শাশ্বত সত্যের মধ্যে যে মূল্যবোধ তার ওপর বিচারগ্রাহ্য করার প্রতি আস্থা। কারো কারো উদ্ধত উক্তি অথবা অসহ্য সংস্কার অন্ধতা থেকে জাগৃতি ভালো মনে না হলেও একটা উত্তাম জীবন থেকেই জীবনীশক্তির সঞ্চার হয়েছিল। যুক্তিবাদী মানসিকতার বিকাশ ঘটিয়ে তাঁরা প্রাচীন প্রথা-সর্বস্ব মানসিকতার অবসান ঘটাতে চাইলেন, চাইলেন যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়ে চিরন্তন সারবস্তুকে গ্রহণ করাতে।

অনেকেই ভারতীয় নবজাগরণকে চিহ্নিত করলেন ইংরাজি শিক্ষার প্রসার ও প্রকাশের সার্থক ফল স্বরূপ বলে। তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের নবীনধারায় স্নাত হয়ে যে প্রজ্ঞা ও প্রজ্ঞান লাভ করলেন তাতেই স্বদেশ ভাবনারও শুভ উদ্বোধন সাধিত হয়েছিল। সেদিন পাশ্চাত্যের দার্শনিক বেন্থাম, মিল অথবা কবি শেলী, কীটস প্রমুখের উন্নত মানসিকতার ও মনীষার ভাব ও ভাবনাকে গ্রহণ করতে অভ্যস্থ হতে থাকলেন। ফ্রয়েডীয় ভাবনাকে কিম্বা মার্কসীয় দর্শনকে বোধগম্য করার প্রস্তুতিপর্বের সূচনা হল। সেক্সপীয়রের নাট্যচরিত্রের রূপকল্পনাকে নিয়ে জগৎকেই এক রঙ্গমঞ্চ বলতে আরম্ভ হল। ঊনবিংশ শতাব্দীর ঊষালগ্নেই ইংরাজি শিক্ষার মহাবিদ্যালয়ের যথার্থ প্রতিষ্ঠা হয়েই গিয়েছিল। যার ফলে প্রজ্ঞা আর প্রজ্ঞানের হল নবরূপায়ণ।

একেশ্বরবাদী রামমোহন বা সংস্কারমুক্ত ডিরোজিও আমাদের মননশীলতার জগতে যে যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা করলেন সেখানেই জন্মগ্রহণ করলো যথার্থ নবীন বঙ্গের কিন্তু তাই শেষ কথা হল না, সব কথা হল না—আরো আরো কথা ও কাজ, মন ও মত ক্রমে ক্রমে মনীষী-মানসের মননে মননে মনোময় হয়ে উঠলো, প্রাণময় হয়ে উঠলো। সমাজ, সংসার, দেশ, জাতি, আচার, ধর্ম—সব নিয়ে সব ভেবেছেন যেমন রামমোহন, আমরা তেমনি বিদ্যাসাগরকেও ভাবছি এমনি ভাবুক রূপে। আমরা ভাবছি রামকৃষ্ণদেব থেকে বিবেকানন্দের উদাত্ত বাণী। আমাদের বিচার ও বিবেকে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নিয়ে সমন্বয়ী ভাবনায় মন উঠছে ভরপুর হয়ে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনচর্যায় ও চর্চায়, মানসকর্মে ও ধর্মে, মননরীতি ও নীতিতে —এই বিচিত্রমুখী ভাবসমন্বয় এমন এক যৌগিক সংমিশ্রণে রসসঞ্চারিত হয়ে ওঠে যে রুচিধানী মানুষ এবং সুরসিক সহৃদয় সামাজিক—সকলেই আপন মনের মাধুর্যেরই যেন পুষ্পিতপ্রকাশ দেখতে পেলে। তাই শুধু অসাধারণই নয় সাধারণ মানুষও তাদের বোবা মুখে ভাষা পেলে, তারা পরিচ্ছন্ন দৃষ্টির অধিকার পেলে, তারা বহুকালের যুগযুগান্তের অনালোকিত অধ্যায়কে আলোকিতচৈতন্যে স্পষ্ট-প্রত্যক্ষে অবলোকন করলে রবীন্দ্র-চেতনায়, রবীন্দ্র-ভাবনায়।

বালক রবীন্দ্রনাথ পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাহচর্যে ঔপনিষদিক ভাবপরিমণ্ডলে আপন মানস-পরিচর্যা করেছেন, জোড়াসাঁকো ঠাকুরপরিবারের বিভিন্নমুখী উন্নয়নমূলক কর্মপ্রচেষ্টায় জীবনযাত্রাকে বিচিত্রধারায় পরিচালিত করেছেন। হিন্দুমেলা, স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থন, বঙ্গভঙ্গরোধে রাখি বন্ধন, শিবাজী উৎসব, জালিয়ানাওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে নাইট উপাধি পরিত্যাগ—রবীন্দ্র-কবিজীবনের এ এক অন্য চেহারার, এ এক অন্য মেজাজের পরিচয়—এর মধ্যে দিয়ে যেন এক অনন্য রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় জীবনধারার দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করলে দেখা যাবে এরও একটা গভীর তাৎপর্য ও ক্রমবিকাশের পরম্পরাগত পারম্পর্য রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনকালের অর্ধেকটা পেয়েছেন উনবিংশ শতাব্দীর আর প্রায় অর্ধেকটা পেয়েছেন বিংশ শতাব্দীর। কারণ তাঁর আশি বছরের জীবন-যাত্রার আরম্ভ ১৮৬১ সালে এবং সমাপ্তি ১৯৪১ আগস্টে। প্রায় চল্লিশ বছর সময়সীমায় তিনি নবজাগৃতির লীলাকালেরই মহানায়ক ছিলেন। তাঁর পূর্ববর্তী মহতী উত্তরাধিকার এক মহান ভাবরাজ্যের সৃষ্টি করেছিল রবীন্দ্র ভাব

ও ভাবনায়, রবীন্দ্র চেতনে ও সাধনে। একদিকে পূর্ববর্তীর ভাবসাধনা অন্যদিকে সমকালের বলিষ্ঠ মানসিক জাগরণ।

একদিন বাংলা গদ্যভাষায় ব্যবহার ও লেখার রূপটি যেমন আড়ষ্ট ছিল তেমনি প্রকাশভঙ্গিও ছিল সংকুচিত। তখন সাময়িক পত্র সম্পাদনার সূচনা হয়েছে। রামমোহন 'ব্রাহ্মণ সেবধি' ৩ সংখ্যার 'নমো জগদীশ্বরায়' অংশের আলোচনায় বলছেন—'জগতের বিচিত্র রচনার সুক্ষ্মদর্শিদের নিকটে প্রসিদ্ধ আছে যে এক পাঠীন মৎস্যের গর্ভে যত ডিম্ব জন্মে তাহা হইতে মনুষ্যজাতির আশ্রয় সমুদায় ব্যক্তিরা গণনায় ন্যূনসংখ্যা হয় এবং শক্তিতে অতিশয় অধিক হয় এ নিমিত্তে মনুষ্য শব্দের জাতিবাচকত্বে কোন ব্যাঘাত হয় এমত নহে।' একেবারে টানা বক্তব্য এবং বলিষ্ঠ উক্তি।

রাজা রামমোহন রায়ের গদ্য আবার অন্য ভাবনায় অন্য সুরেও কথা বলেছিল। তিনি ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'কবিতাকারের সহিত বিচার' পুস্তিকার 'ভূমিকা'য় লিখছেন—'পরের নিন্দা করিয়া যেমন শিষ্ট ব্যক্তি দুঃখিত হয়েন সেইরূপ দুর্জ্জন ব্যক্তি পরের নিন্দা করিয়া আহ্লাদিত হয়। কিন্তু কবিতাকারকে অন্য কোন কবিতাকার তদনুরূপ প্রত্যুত্তর দিতে যদি বাসনা করে তাহাতে আমাদের হানি লাভ নাই। সংপ্রতি কবিতাকার যে সকল পরমার্থ বিষয়ের অপবাদ আমাদের প্রতি দিয়াছেন তাহার প্রত্যুত্তর লিখিতেছি।' নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে অপরের দোষারোপ খণ্ডন করার একটা তীব্রতা ছিল তাঁর ভাষায়। তিনি 'গোস্বামীর সহিত বিচার' ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে প্রকাশ করেন। সেখানেও বলছেন—'অদ্বিতীয় ইন্দ্রিয়ের অগোচর সর্ব্বব্যাপী যে পরব্রহ্ম তাঁহার তত্ত্ব হইতে লোক সকলকে বিমুখ করিবার নিমিত্তে ও পরিমিত এবং মুখ নাসিকাদি অবয়ব বিশিষ্টের ভজনে প্রবর্ত্ত করাইবার জন্যে ভগবদ্গৌরাঙ্গপরায়ণ গোস্বামিজী প'রপূর্ণ ১১ পত্রে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাহার উত্তর প্রত্যেকে দেওয়া যাইতেছে বিজ্ঞ সকলে বিবেচনা করিবেন।' প্রকাশভঙ্গির ঋজুতা এবং সবিনয়ে যুক্তিনিষ্ঠ নিবেদন রয়েছে মৌলবক্তব্যে।

'গৌড়ীয় ভাষা ব্যাকরণ' রচনা করলেন রামমোহন। প্রথম অধ্যায়েই লিখেছেন—'সকল প্রাণির মধ্যে মনুষ্যের এক বিশেষ স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম্ম হয়, যে অনেকে পরস্পর সাপেক্ষ হইয়া একত্র বাস করেন। পরস্পর সাপেক্ষ হইয়া এক নগরে অথবা এক গৃহে বাস করিতে হইলে সুতরাং পরস্পরের অভিপ্রায়কে

জানিবার এবং জানাইবার আবশ্যক হয়। মনুষ্যের অভিপ্রায় নানাবিধ হইয়াছে, এবং কণ্ঠ তালু ওষ্ঠ ইত্যাদির অভিঘাতে নানা প্রকার শব্দ জন্মিতে পারে, এ নিমিত্তে এক ২ অভিপ্রেত বস্তুর বোধ জন্মাইবার নিমিত্তে এক ২ বিশেষ শব্দকে দেশ ভেদে নিরূপিত করিয়াছেন।'

রাজা রামমোহন রায় যে যুক্তিনিষ্ঠ মানসিকতার উদ্বোধনে আত্মনিয়োগ করেন তার ফলেই তো শতাব্দীর তীর ছাপিয়ে নবজাগৃতির চিন্তামননে বাঙালীর ভাবরাজ্য সার্থক ভাবনায় ফলপ্রদ হয়ে উঠেছে। তিনি ভারতভাবনা তথা বিশ্বমৈত্রীর বাণী জীবনকর্মে রূপায়িত করার প্রচেষ্টার নানা বিচিত্র ধারণায় নিযুক্ত ছিলেন। আত্মীয় সভায় যার সূচনা তা তো ক্রমে ক্রমে দেশে দেশে চলতে থাকে আত্মীয়তা স্থাপনের স্বপ্নেই।

ব্রাহ্মসমাজ, এনিবেসান্তের থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি, আর্য সমাজ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চিন্তা, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রচেষ্টা - সব কিছু মিলিয়ে-মিশিয়ে একটা গ্রহণ করার মন ও মনন গড়ে উঠতে লাগার সময়ে যে যুগ ও যুগের চিন্তা তার অপূর্ব অগ্রগমন উনবিংশ শতাব্দীতে। তখনই ইংরেজ রাজত্ব থেকে যথার্থ বিমুক্তির স্বদেশী ভাবনার স্বপ্নও জেগেছে। বিপ্লবী কর্মধারা আসছে আবার অহিংসার আন্দোলনও জাগছে।

ভারতচন্দ্রের থেকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতার গণ্ডি ছাপিয়ে দেশ মধুসূদনের মেঘনাদবধকাব্যের পাশাপাশি বিহারীলালের গীতিকবিতাও পেয়েছে। আবার 'বন্দেমাতরম্'-মন্ত্রের বাণী উদ্গাতা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক রোমান্সরসের উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নীতিনিষ্ঠ প্রবন্ধ আর ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সামাজিক প্রবন্ধাবলীও পাঠ করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ' থেকে বিবেকানন্দের 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর' শুনতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। জ বকে শিবজ্ঞানে সেবার আদর্শ অনুরণিত হতে শুরু হচ্ছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কিছু আগেই 'বোধোদয়' ঘটালেন বাঙালীর নিশ্চেষ্ট এবং নৈরাশ্যজনক বিলাস সর্বস্ব জীবনধারায়। তাঁর সঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তেরও কথা স্মরণীয়। তখন সবে বিদ্যাসাগর 'চেতন পদার্থ' কি তা সহজ কথায় বললেন—'পুত্তলিকার চক্ষু আছে, দেখিতে পায় না; মুখ আছে, খাইতে পারে না; নাসিকা আছে, গন্ধ পায় না; হস্ত আছে, কোনও কর্ম করিতে পারে না; কর্ণ আছে, কিছু শুনিতে পায় না; চরণ আছে, চলিতে পারে না।

ইহার কারণ এই, পুত্তলিকা অচেতন পদার্থ, উহার চেতনা নাই। ঈশ্বর কেবল জন্তুদিগকে চেতনা দিয়াছেন।' সরল ভাষায় বিরল অভিব্যক্তি।

বিদ্যাসাগর তাঁর ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত 'বোধোদয়' গ্রন্থের 'মানবজাতি' অংশের আলোচনায় একেবারে সহজভাবে বলেই ফেললেন—'মানবজাতি, বুদ্ধি ও ক্ষমতাতে, সকল জন্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহাদের বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি আছে; এজন্য, সর্ব্ববিধ জন্তুর উপর আধিপত্য করে।' এমনি ভাবে আবার 'বাক্য কথন—ভাষা' অংশের আলোচনায় বলছেন—'মনুষ্যেরা, মুখ দ্বারা শব্দের উচ্চারণ করিয়া, মনের ভাব ব্যক্ত করে। শব্দের উচ্চারণ বিষয়ে জিহ্বাই প্রধান সাধন। শব্দের উচ্চারণকে কথা কহা বলে এবং উচ্চারিত শব্দের নাম ভাষা। যে শক্তি দ্বারা শব্দের উচ্চারণ নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে বাক্‌শক্তি বলে।' বিদ্যাসাগর মহাশয় ভাষা প্রসঙ্গের প্রাথমিক কথা বলতে বলতে বলছেন—'ইঙ্গরেজেরা এক্ষণে আমাদের দেশের রাজা, সুতরাং ইঙ্গরেজী আমাদের রাজভাষা। এ নিমিত্ত, সকলে আগ্রহপূর্ব্বক ইঙ্গরেজী শিখে। কিন্তু অগ্রে জাতিভাষা না শিখিয়া পরের ভাষা শিখা কোনও মতে উচিত নহে।' এখানে রামনিধি গুপ্তের টপ্পার এক কলি স্বভাবতই মনে এসে যায়—'বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা?' বিদ্যাসাগর মহাশয় তাই বলছেন—'পূর্ব্ব কালে, ভারতবর্ষে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহার নাম সংস্কৃত। সংস্কৃত অতি প্রাচীন ও অতি উৎকৃষ্ট ভাষা। এ ভাষা এখন আর চলিত ভাষা নহে। কিন্তু ইহাতে অনেক ভালো ভালো গ্রন্থ আছে। সংস্কৃত ভাল না জানিলে, হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষাতে উত্তম ব্যুৎপত্তি জন্মে না।' যিনি বিধবা বিবাহের প্রচলন করলেন, যিনি বহুবিধ সমাজ সংস্কারের প্রবর্তক তিনি শিক্ষার প্রচার ও প্রসার করালেন এবং সমাজকল্যাণের বনিয়াদও রচনা করলেন।

'প্রাচীনা ও নবীনা' প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্র যুগমানসের এক যথার্থ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন—'আমাদিগের সমাজসংস্কারকেরা নূতন কীর্ত্তিস্থাপনে যাদৃশ ব্যগ্র, সমাজের গতি পর্য্যবেক্ষণায় তাদৃশ মনোযোগী নহেন। "এই হইলে ভাল হয়, অতএব এই কর" ইহাই তাঁহাদিগের উক্তি, কিন্তু কি করিতে কি হইতেছে, তাহা কেহ দেখেন না। বাঙ্গালীরা যে ইংরেজী শিখে, ইহাতে সকলেরই উৎসাহ। কিন্তু ইহার ফল কি, তাহার সমালোচনা কেবল আজিকালি হইয়াছে। এক শ্রেণীর লোক বলেন, ইহার ফল মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক বলেন, দুই একটি ফল

সুপক্ক এবং সুমধুর বটে, কিন্তু অধিকাংশ তিক্ত ও বিষময়—উদাহরণ মাতালের দল এবং সাধারণ বাঙ্গালী লেখকের পাল।' বঙ্কিমচন্দ্র হয়তো তাৎক্ষণিক একটি বিশেষ মানসভঙ্গির মনোলীন হয়ে এমনি ভাবনায় নিমগ্ন ছিলেন। যথার্থভাবে সেযুগে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমস্ত চিন্তাকে শুচিশুভ্রপথে পরিচালিত করতে চাইছেন। সেখানে কোনো ভ্রষ্টতা অথবা বিজাতীয়তা পছন্দ না করাটাই স্বাভাবিক। যদিও তিনি পাশ্চাত্ত্য ভাব ও ভাবনায় প্রতিনিয়তই অভিষিক্ত হচ্ছিলেন সত্যিই কিন্তু নিজস্ব সত্তাকে বিলীন করে দেন নি। তিনি আপন স্বভাব ও ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেন নি। নতুন নতুন চেতনাকে তিনি সঞ্চারিত করতে চাইলেন কিন্তু নিজের বঙ্কিম-দৃষ্টিতে যেন উচ্ছ্বাসকে পাঠকের চোখেও ধরিয়ে দিতে চাইছেন। তাই তিনি বললেন—'আবার দিনকত ধূম পড়িল, স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার সংস্কার কর, স্ত্রীশিক্ষা দাও, বিধবা-বিবাহ দাও, স্ত্রীলোককে গৃহপিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া উড়াইয়া দাও, বহুবিবাহ নিবারণ কর এবং অন্যান্য প্রকারে পাঁচী, রামী, মাধীকে বিলাতী মেম করিয়া তুল। ইহা করিতে পারিলে যে ভাল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু পাঁচী যদি কখন বিলাতী মেম হইতে পারে, তবে আমাদিগের শালতরুও একদিন ওকবৃক্ষে পরিণত হইবে, এমন ভরসা করা যাইতে পারে।' উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ সমাজের এমন নিখুঁত ও নিপুণ চিত্র খুব কমই পাওয়া যায়। আধুনিকতার জোয়ারে যে পরিবর্তনের ঢেউ সমাজজীবনে এসে লেগেছে তার সম্পর্কে নির্ভীক মতামত বঙ্কিমচন্দ্র অসংকোচে দিয়েছেন। 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের এই 'প্রাচীনা ও নবীনা' রচনাটিতে বঙ্কিমচন্দ্র যে মনোভাব ব্যক্ত করলেন তাতে তখন তিন জন স্ত্রীলোক প্রতিবাদ পত্র পাঠান 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায়। হয়তো এই পত্রত্রয় সম্পাদকীয় বিভাগেরও হতে পারে কিন্তু একটা স্ত্রী প্রগতির শুভ পদধ্বনি যে আরম্ভ হয়েছিল তার পরিচিতি থেকেই গিয়েছে যে, তার আর কোনো সন্দেহ নেই। 'অনুকরণ' নামে একটি আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন—'জগদীশ্বর-কৃপায় উনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বাঙ্গালী নামে এক অদ্ভুত জন্তু জগতে দেখা গিয়াছে।' এই যে 'অদ্ভুত জন্তু' এদের সম্পর্কে অনেক কথা বলেও একটা খাঁটি কথা বললেন—'অনুকরণমাত্র কি দূষ্য? তাহা কদাচ হইতে পারে না। অনুকরণ ভিন্ন প্রথম-শিক্ষার উপায় কিছুই নাই। যেমন শিশু বয়ঃপ্রাপ্তের বাক্যানুকরণ করিয়া কথা কহিতে শিখে, যেমন সে বয়ঃপ্রাপ্তের কার্য্য সকল দেখিয়া কার্য্য করিতে শিখে, অসভ্য এবং অশিক্ষিত জাতি সেইরূপ সভ্য এবং

শিক্ষিত জাতির অনুকরণ করিয়া সকল বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। অতএব বাঙ্গালী যে ইংরেজের অনুকরণ করিবে, ইহা সঙ্গত ও যুক্তিসিদ্ধ।' বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী জাতির উনিশ শতকীয় জীবনধারার এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির মৌল বিষয়ের দিকে পাঠকের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিয়েছেন। তিনি জাতিগতভাবে বাঙালীর স্বভাব বৈশিষ্ট্যকেই এখানে তুলে ধরেছেন। 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা' রচনাটিতে সুন্দর যুক্তিসহ বলছেন— 'আধুনিক ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় অর্থাৎ উচ্চ শ্রেণীর লোকের অবনতি ঘটিয়াছে, শূদ্র অর্থা সাধারণ প্রজার একটু উন্নতি ঘটিয়াছে।'

বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের কলমে 'একা' রচনাটিতে লিখেছিলেন—'কেহ একা থাকিও না। যদি অন্য কেহ তোমার প্রণয়ভাগী না হইল, তবে তোমার মনুষ্য জন্ম বৃথা। পুষ্প সুগন্ধি, কিন্তু যদি ঘ্রাণ গ্রহণ কর্তা না থাকিত, তবে পুষ্প সুগন্ধি হইত না– ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট না থাকিলে গন্ধ নাই। পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয়-কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।' এই রচনাতেই আর একটি ঋষিবাক্য উচ্চারণ করলেন—'প্রীতি সংসারে সর্বব্যাপিনী ঈশ্বরই প্রীতি।'

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বপর্বে রামমোহন যে মননশীলতার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তারই ধারা নানা মনীষীর রচনায় রচনায় অনুরণিত এবং অনুশীলিত হয়ে এক গভীর জ্ঞানের বাতাবরণ রচনা করেছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখলেন তেমনি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'কে কেন্দ্র করে কিছু লেখক বাংলায় জ্ঞানবিজ্ঞানের নব নব দিগন্ত উদ্ঘাটিত করেছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজনারায়ণ বসু অক্ষয়কুমার দত্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের কথা স্মরণীয়। টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকসা' বা 'সমাচার চন্দ্রিকা'র সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়'এর বিশেষ স্বাদের রচনাও বাংলা ভাষায় প্রচলিত হয়েছিল। এর পরই উল্লেখের বিশেষ দাবিদার ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নাম। তিনি পারিবারিক বা সামাজিক নানা সমস্যামূলক অনেকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন যা কর্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন সহৃদয় সামাজিকেরই অবশ্য করণীয় কার্যস্বরূপ হয়েছিল বলা যায়। তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের ক্ষুদ্রতা ও ভ্রান্তি, আমাদের কুসংস্কার ও চক্ষুলজ্জা, আমাদের পরনির্ভরশীলতা ও পরশ্রীকাতরতা যে কত ক্ষতিকর তা

দেখিয়েছিলেন সহানুভূতির সঙ্গে, সহৃদয়তার সঙ্গে। তাই এক অর্থে তাঁর নীতিকথা আমাদের সচেতনাতায় প্রীতিকথা হয়ে উঠেছিল। এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার বিষয়ে দৃষ্টি ফেরাতে হয়। কত রকমের কত রচনাই না তখন রচিত হয়েছে উপন্যাস গল্প লেখার সঙ্গে সঙ্গেই। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ' বা চন্দ্রনাথ বসুর 'পৃথিবীর সুখ দুঃখ' এই সময়েই রচিত হয়েছে। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় অক্ষয়চন্দ্র সরকার কেশবচন্দ্র সেন নবীনচন্দ্র সেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ কালীপ্রসন্ন ঘোষ থেকে শিবনাথ শাস্ত্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ মননশীল প্রাবন্ধিকের অবদান অভিনব।

রবীন্দ্রনাথ 'ইতিহাস' গ্রন্থের 'ভারত ইতিহাস চর্চা' প্রবন্ধে বলেছেন—'প্রত্যেক জাতির সমস্যা সেখানেই, যেখানে তাহার অসামঞ্জস্য। যাহারা বাহিরে পাশাপাশি আছে অন্তরে তাহাদিগকে মিলিতেই হইবে। এই মিলন-চেষ্টাই মানুষের ধর্ম, এই মিলনেই মানুষের সকল দিকে কল্যাণ। সভ্যতাই এই মিলন।' তিনি 'বিবিধ প্রসঙ্গ' গ্রন্থে 'মনের বাগান-বাড়ি' অংশে উচ্চারণ করলেন—'ভালবাসা অর্থে, নিজের যাহা কিছু ভাল তাহাই সমর্পণ করা। হৃদয়ে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা নহে; হৃদয়ের যেখানে দেবত্রভূমি, যেখানে মন্দির, সেইখানে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা।'

মানবতার পূজারী রবীন্দ্রনাথ 'মানুষের ধর্ম'কে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং চিন্তা করেছেন যুগসমস্যার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই। তিনি দেশ-বৈদেশিক চেতনায় বিশ্ব-দৈশিক চৈতন্যকে জাগৃতির আলোকবর্তিকা নিয়ে আনলেন অজস্র গীতদীপ্তি। একটি পত্রে কেমন সুন্দরভাবে এটি ব্যক্ত হয়েছে, যেখানে বলছেন—'অথচ তিনিই আমাদের একমাত্র যাঁকে অবলম্বন করে আমাদের চিত্ত দেশ ও জাতিগত সমস্ত সংকোচ অতিক্রম করে বিশ্বের সঙ্গে মিলিত হবে—তাঁকে অবলম্বন করে আমাদের সর্বত্র প্রবেশাধিকার বিস্তৃত হবে। কিন্তু আমাদের দেশে ধর্মই মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ ঘটিয়েছে। আমরাই ভগবানের নাম করে পরস্পরকে ঘৃণা করেছি, স্ত্রীলোককে হত্যা করেছি, শিশুকে জলে ফেলেছি, বিধবাকে নিতান্তই অকারণে তৃষ্ণায় কষ্ট করেছি, নিরীহ পশুদের বলিদান করেছি এবং সকল প্রকার বুদ্ধি-যুক্তিকে একেবারে লঙ্ঘন ক'রে এমন সকল নিরর্থকতার সৃষ্টি করেছি যাতে মানুষকে মূঢ় ক'রে ফেলে। আমরা ধর্মের নামে অপরিচিত মুমূর্ষুকে পথের ধারে পড়ে মরে যেতে দিই; পাছে

জাত যায় (এ আমার জানা) অপরিচিত মৃত দেহকে সংকার করিনে—মানুষের স্পর্শকে বীভৎস জন্তুর চেয়ে বেশি ঘৃণা করি। কেন এমন হয়েছে।' রবীন্দ্র-জীবনী বিচিত্র ভাবনায় দোলায়িত, নানান স্রোতে প্রবাহিত।

আবার লোকপ্রচলিত ধর্মমতের মৌলভূমিতে অবতীর্ণ হয়ে তিনি বলছেন—'সম্প্রদায়িত বৈষ্ণবের হাত থেকে বিষ্ণুকে, সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মের হাত থেকে ব্রহ্মকে উদ্ধার করে নেবার জন্ত বিশেষভাবে সাধন করতে হয়।' এই সূত্রেই আবারো বললেন—'আমরা খ্রীস্টধর্মের মর্মকথা গ্রহণ করবার চেষ্টা করব খ্রীস্টানের জিনিস বলে নয়, মানবের জিনিস বলে।' রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-মানবতার যে মহতী স্বপ্ন দেখলেন তাইতো উনিশ শতকীয় নবজাগৃতিরই অন্যতম স্বরূপ ধর্ম হয়ে রয়েছে। রয়েছে নতুন যুগের নতুন মানুষদেরও ধারণযোগ্য এক ধর্মই। কোনো গোষ্ঠীর মত নয় সর্বকালের সর্বদেশের সত্যধর্মের মধ্যেই মানবধর্ম। এবং সেই মন ও মত নিয়ে সমকালকে উপেক্ষা করে নয়, সমকালকে নিয়েই চিরকালের মানুষ। তাই রবীন্দ্রনাথ কালোত্তীর্ণ হয়েও কালোপযোগী। তাই পরাধীন ভারতের স্বদেশ প্রীতির বাণী প্রচলিত লৌকিক সুরেই রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করলেন—

'ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতেই বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।'

কিংবা—

'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।
ঘরের হয়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে।'

আবার খোলামেলা আহ্বানের সুরও জাগলো, যেখানে গাইলেন—

'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, 'জয় মা' ব'লে ভাসা তরী।
ওরে রে ওরে মাঝি, কোথায় মাঝি, প্রাণপণে ভাই, ডাক দে আজি—
তোরা সবাই মিলে বৈঠা নে রে, খুলে ফেল্ সব দড়াদড়ি।'

বিভেদের প্রাচীর দিয়ে যে বিচ্ছেদের সূচনা তাকে অস্বীকারেরই বোধ, সেই তো উনিশ শতকীয় বোধিজ্ঞানেরই যেন পুনঃপ্রচার। এখানেই আত্মচেতনার যথার্থ উদ্বোধন। এখানেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনের মুক্তির পথকে দেশের এবং বিশ্বের, জাতির এবং আন্তর্জাতিকতার দিগন্তে উত্তরণ ঘটিয়েছেন। 'উৎসর্গ'এর 'প্রবাসী' কবিতায় বলেছিলেন—'—দেশে দেশে মোর দেশে আছে আমি সেই দেশ লব যুঝিয়া।'

এবং বিশ্বমন স্বদেশমনে আবার ফিরে এসে সকলকে কোলে টেনে নিচ্ছেন এবং বলছেন —

'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরী।'

এ কথা বলেও যেমন তিনি গর্ববোধ করছেন আবার আত্মচেতনায় সজাগ বাস্তববোধেও বলছেন— 'বণিকের মানদণ্ড, পোহালে শর্বরী, দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে...'

একদিকে দেশাত্মবোধ অপর দিকে দেশাতীত বিশ্ববোধ। রবীন্দ্রনাথের এবং উনিশ শতকীয় মনীষীমানসের এই বিশিষ্ট অনুভব তাঁরা এক মহতী ঐতিহ্য রূপে রেখে গিয়েছেন পরবর্তী যুগেরই প্রজন্মের জন্যে। কত মনীষীধারায় কত মানসমহিমার আদর্শে যে উনবিংশ শতাব্দী আলোকিত, কত যে বিগত শতকের গরিমা সেখানে রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধের উত্তুঙ্গ শীর্ষে এবং উন্নতরূপে অজস্র কর্মে ও মর্মে বারবার প্রকাশিত হয়েছে তা অভাবনীয়। রবীন্দ্রনাথ একটা শুধু কবিজীবনে নয় একটা অখণ্ড মানবতাবোধে উদ্বোধিত ছিলেন যে তাই সমস্ত শতাব্দীর সৌরভটি তাঁরও মানসচৈতন্যকে ঘিরে রয়েছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেশ-বিদেশের নবীনভাবনার আলোককে তিনি দেশের মানুষের কাছে অজস্রধারায় প্রবাহিত করতে চাইলেন এবং দেশের প্রাচীন সাহিত্যকেও সংরক্ষণের পথ দেখালেন। তাঁর ছেলে ভুলনো ছড়ার সংগ্রহ নিয়ে প্রবন্ধটির কথা এখানে স্মরণে আসবে। সেখানে তিনি বলছেন—'ইহার সহিত যে স্নেহটি, যে সংগীতটি, যে সন্ধ্যাপ্রদীপালোকিত সৌন্দর্যচ্ছবিটি চিরদিন একাত্মভাবে মিশ্রিত হইয়া আছে সে আমি কোন্ মোহমন্ত্রে পাঠকদের সম্মুখে আনয়া উপস্থিত করিব! ভরসা করি, এই ছড়াগুলির মধ্যেই সেই মোহমন্ত্রটি আছে।' তিনি 'আট-ঘাট-বাঁধা রীতিমত সাধুভাষার প্রবন্ধের মাঝখানে' গ্রাম্য ছড়ার মধ্যে পল্লীমায়ের স্বপ্নলোককে সুদূরপ্রসারী কবির মানসলোকের রূপশিল্পরূপে আবিষ্কার করলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যে রবীন্দ্রনাথকে মাল্যভূষিত করেছিলেন উষালগ্নে তারই তো প্রখর দীপ্তিতে উদ্বোধিত হয়ে জাতির চিরকালীন শ্রদ্ধার মাল্য তাঁর প্রাপ্য হয়ে রয়েছে। 'দেশের শ্রীবৃদ্ধি'র কথা বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় ছিল, রচনায় ছিল। রবীন্দ্রনাথ সমবায় আন্দোলনের তাৎপর্য উপলব্ধি করালেন দেশের মানুষকে। শেষরক্ষা না হলেও সমবায় ব্যাঙ্ক এবং কৃষির ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করার প্রচেষ্টা

তো নিজের অর্থ বিনিয়োগেও করিয়েছিলেন। তাঁর কাজটিকে দেশের বৃহত্তর জনসাধারণ যদি সেদিন যথাযথভাবে গ্রহণ করতে পারতো তা হলে হয়তো গ্রামীণ অর্থনীতিতে একটা নবযুগ আসতো, একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বাতাবরণে পল্লীসংগঠন ও দেশজ শিল্পের সম্প্রসারণ মহৎ সার্থকতা লাভ করতো। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে 'পল্লী প্রকৃতি' গ্রন্থের 'কর্মযজ্ঞ' আলোচনাংশে বলছেন—'কলিযুগের কলদৈত্য স্বর্গের দেবতাদের নির্বাসিত করে দিয়েছে, কিন্তু আবার তো স্বর্গকে ফিরে পেতে হবে। শিবের তৃতীয় নেত্র অগ্নি উদ্গীরণ না করলে কেমন করে সেই মঙ্গল ভূমিষ্ঠ হবে যা দৈত্যের হাত থেকে স্বর্গকে উদ্ধার করবে।'

উনবিংশ শতাব্দীর মানসিকতায় যে সমন্বয়-চেতনা ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে তারই সহজ রূপ ধর্মসাধনায় দেখালেন বিবেকানন্দ আর কর্মসংস্কৃতিতে দেখালেন রবীন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতনের ভাষণাবলী, বিভিন্ন প্রবন্ধমালা বা কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ভারততীর্থের স্বপ্ন দেখলেন সমন্বয়ী দৃষ্টিকোণ থেকেই। শুধু যা আছে তাই সব নয় যা আসছে তাও অনেকখানি। আছে যা আছে তারও ওপর নতুনের সংযোগ ও সংরাগ এবং তাকে স্বীকৃতি দিয়েই রবীন্দ্রনাথ বললেন—'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে।' এক দেহে লীন হয়ে তিনি ভারতীয় চেতনার উদ্বোধনসাধন করার বাণীপ্রচারেই করেছিলেন আত্মনিয়োগ। একদিন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বা রামমোহন-দয়ানন্দ-শ্রদ্ধানন্দ বা অনাগরিক ধর্মপাল যে জীবে শিবশক্তি উদ্বোধনের প্রচেষ্টায় উদ্বোধিত ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিমানসেও নবীন সভ্যতার উদগ্র মানসিকতার অবসানে সত্য শিব-সুন্দরের চিন্তা আনলেন। মহাযুদ্ধের ভয়াবহতাকে অস্বীকার করার জন্যে তিনি শান্তিবাণী উচ্চারণ করলেন। তাঁর 'নৈবেদ্য' কবিতাবলীর উদাত্তধ্বনি দেশে দেশে জনে জনে উচ্চারিত হওয়ার মন্ত্র হয়ে উঠলো, চেতনাকে জাগ্রত করার বাণী হয়ে উঠলো। রবীন্দ্র-কবিমানসের অনুরণিত অনুভূতির গভীরেই উচ্চারিত হল—

> 'শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে
> অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে
> অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
> ভয়ংকরী।'

এবং তখনই তো আবার ভয়শূণ্যচিত্তে ও উচ্চশিরেই রবীন্দ্রনাথ বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললেন—

'যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করে নি শতধা ; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।'

তিনি তাঁর ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত উপনিষদমন্ত্রে দীক্ষিত চৈতন্যে আপন শতাব্দীকেই আলোকিত করে তুললেন। 'জনগণমন অধিনায়ক' রূপে এক উজ্জ্বল জগৎ নিয়ে রবীন্দ্র-মানসরাজ্য। বহু সাধকের ও বহুযুগের সমন্বিত সাধনার ধারা নিয়ে অপূর্ব মিলনগাঁথার ঋত্বিক রবীন্দ্রনাথ, কারণ যৌগিক ভাবসাধনা নতুন-মন্ত্রে মৌলিক ভাবনার বাণীরূপ গ্রহণ করেছে রবীন্দ্রনাথে। 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা' বলার উদার আহ্বান বা 'যত মত তত পথ' শোনার উন্নতলোকের মানসিকতা—সংস্কারশূণ্য রবীন্দ্র-মানসে নবীন প্রেরণার উৎস-ভূমি। যুগের হয়েও যুগাতীত মানসে রবীন্দ্র-ভাবনা ক'বর ভাষায় রূপ নিয়েছে অপূর্ব প্রকাশে। সমাজতন্ত্রবাদের প্রভাব যখন যুগচিত্তে তখন 'চিত্রা' পর্বে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

'লেখাপত্র কেড়েকুড়ে— কোথা কী যে গেল উড়ে,
ওই রে আকাশ জুড়ে ছড়ায় 'সমাজতত্ত্ব'।'

রবীন্দ্রনাথ 'সমাজ' গ্রন্থের 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ' প্রবন্ধে বললেন—'জাতকর্ম থেকে আরম্ভ করে অন্ত্যেষ্টিসংকার পর্যন্ত যে সকল অনুষ্ঠান উপলক্ষে ঘরের মধ্যে বাহিরের অধিকার স্বীকার করাকে আমরা ধর্মের নির্দেশ বলে জানি, যে সকল ক্রিয়াকর্মে আমন্ত্রিতদের কাছেই গৃহস্থ আপন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা কর্তব্য বলে গণ্য করে।' বিস্তৃত আলোচনার ধারাপথে আরো বলছেন—'অন্যকে আক্রমণের উদ্দেশে নয়, কিন্তু পরস্পরকে রক্ষণ ও পালনের উদ্দেশে যেখানেই বহুলোক সমবেত হয় সেখানে স্বভাবতই পরার্থপর ধর্মনীতির উদ্ভব হয়ে থাকে। অর্থাৎ গোড়ায় যেটা প্রয়োজনের পথ-অনুসরণে আসে, ক্রমে তার লক্ষ্যটা স্বার্থকে অতিক্রম করে পরমার্থ দেখতে পায়।'

'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীর পিলসুজের প্রদীপশিখার দীপ্তি

বিচ্ছুরিত হয়েছে রবীন্দ্র-কণ্ঠে—'য়ুরোপের প্রদীপের মুখে শিখা এখন জলিতেছে। সেই শিখা হইতে আমাদের প্রদীপ জালাইয়া লইয়া আমাদিগকে কালের পথে আর একবার যাত্রা করিয়া বাহির হইতে হইবে।' তিনি সচেষ্ট প্রয়াসে অগ্রগতি চাইলেন, নিশ্চেষ্টতা নয়। উদ্যম ও উৎসাহ, আবিষ্কার ও আহরণ, কল্যাণবোধ ও শুভবুদ্ধি সর্বদা গ্রহণ। কারণ 'পৃথিবীতে আমাদেরও যে প্রয়োজন আছে, সে প্রয়োজন আমাদের নিজের ক্ষুদ্রতার মধ্যেই নহে, তাহা নিখিল মানুষের সঙ্গে জ্ঞান প্রেম কর্মের নানা পরিবর্ধমান সম্বন্ধে, নানা উদ্ভাবনে, নানা প্রবর্তনায় জাগ্রত থাকিবে ও জাগরিত করিবে; আমাদের মধ্যে সেই উদ্যম সঞ্চার করিবার জন্য ইংরেজ জগতের যজ্ঞেশ্বরের দূতের মতো জীর্ণদ্বার ভাঙিয়া আমাদের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাহাদের আগমন যে-পর্যন্ত না সফল হইবে, জগৎ-যজ্ঞের নিমন্ত্রণে তাহাদের সঙ্গে যে-পর্যন্ত না যাত্রা করিতে পারিব, সে-পর্যন্ত তাহারা আমাদিগকে পীড়া দিবে, তাহারা আমাদিগকে আরামে নিদ্রা যাইতে দিবে না।' পশ্চিমের জগতে ইংরেজের সঙ্গে সমান আসন লাভে ভারতবাসীর মর্যাদা। এই মর্যাদার বস্তুটি যে উপলব্ধির পথে উপস্থাপন তা সমাজ সচেতন কবিরই যোগ্যবাণী।

'কালান্তর' পর্যায়ের আলোচনাগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ 'লোকহিত' প্রবন্ধে তাই বলেছিলেন—'যে বড়ো সে ছোটোর অপকার অতি সহজে করিতে পারে, কিন্তু ছোটোর উপকার করিতে হইলে কেবল বড়ো হইলে চলিবে না—ছোটো হইতে হইবে, ছোটোর সমান হইতে হইবে। মানুষ কোনো দিন কোনো যথার্থ হিতকে ভিক্ষারূপে গ্রহণ করিবে না, ঋণরূপেও না, কেবলমাত্র প্রাপ্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারিবে।'

উপলব্ধির মৌলভূমিতে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ সময় সমাজ ও দেশকে যথাযথ-ভাবে বুঝতে ও বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি সমকালের হয়েই চিরকালের কথা বলেছিলেন। আধুনিক সভ্যতার অগ্রগমনের বৈজয়ন্তীর চিত্র সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করে 'সমবায়নীতি' গ্রন্থের 'ভারতবর্ষে সমবায়ের বিশিষ্টতা' প্রবন্ধে যা বললেন তা যুগযুগান্তের সত্য। তিনি বলছেন—'সমাজের ভিত্তিই হচ্ছে সামঞ্জস্য। তাই যখনই সেই সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে এমন সকল রিপু প্রবল হয়—এমন-সকল ব্যবস্থাবিপর্যয় ঘটে যা সমাজবিরুদ্ধ, যাতে করে অল্প লোকে বহু লোকের সংস্থানকে নষ্ট করে, তাদের সকলকে আপন ব্যক্তিগত ঐশ্বর্যবৃদ্ধির উপকরণে ব্যবহার করতে থাকে, তখন হয় সমাজ সেই অত্যাচারে জীর্ণ হয়ে

বহু লোকের দুঃখ ও ব্যস্ত-ভারে আধ মরা হয়ে থাকে নয় তার আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে.' রবীন্দ্রনাথ তাঁর কালের ঘণ্টাধ্বনি সচেতনভাবেই শুনেছেন।

রবীন্দ্রনাথ জীবনের অনেকপর্বে বিভক্ত বিচিত্র মানসিকতায় অগ্রসর হয়েছেন। কিন্তু দেশ কাল ও সমাজকে সচেতন ভাবেই তিনি চেতনায় তীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছেন। তিনি তাই বলতে পেরেছিলেন -'কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে - সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।'

অথবা এরও আগে 'মানসী' পর্বে —

'নিভৃত এ চিত্ত মাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ-আঘাত।'

তিনি প্রাণের গভীরে যা গ্রহণ করলেন তারই প্রকাশ ঘটালেন গানের নিবিড়ে—সুরে রসে ভরপুর করে। তাই রবীন্দ্রনাথের বাণীর মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে যথার্থভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতি এবং তারই মধ্যে দিয়ে প্রকটিত ভারতীয় সমন্বয়বাদের আসল স্বরূপটি।

'মানুষের ধর্ম' ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ বললেন—'মানুষ আছে তার দুই ভাবকে নিয়ে, একটা তার জীবভাব, আর একটা বিশ্বভাব। জীব আছে আপন উপস্থিতকে আঁকড়ে, জীব চলছে অশু প্রয়োজনের কেন্দ্র প্রদক্ষিণ করে। মানুষের মধ্যে সেই জীবকে পেরিয়ে গেছে যে সত্তা সে আদর্শকে নিয়ে। এই আদর্শ অন্নের মতো নয়, বস্ত্রের মতো নয়। এ আদর্শ একটা আন্তরিক আহ্বান, এ আদর্শ একটা নিগূঢ় নির্দেশ। কোন্ দিকে নির্দেশ। যে দিকে সে বিচ্ছিন্ন নয়, যে দিকে তার পূর্ণতা, যে দিকে ব্যক্তিগত সীমাকে সে ছাড়িয়ে চলেছে, যে দিকে বিশ্বমানব।' রবীন্দ্রনাথ ভারতীয়-বোধের উপলব্ধিকে নতুন চিন্তায় চিহ্নিত করলেন। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে আরো স্পষ্ট করে তিনি বললেন—'ভারতবর্ষ অসংকোচে অন্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং অনায়াসে অন্যের সামগ্রী নিজের করিয়া লইয়াছে।' তিনি আবারো বলছেন—'পৃথিবীর সভ্যসমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে'।

রবীন্দ্রনাথ ১৩১৮ বঙ্গাব্দে 'রূপ ও অরূপ' প্রবন্ধে লিখছেন—'শুনা যায় শক্তি-উপাসক কোনো একজন বিখ্যাত ভক্ত মহাত্মা আলিপুর পশুশালায় সিংহকে বিশেষ করিয়া দেখিবার জন্য অতিশয় ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন

—কেননা "সিংহ মায়ের বাহন।" শক্তিকে সিংহরূপে কল্পনা করিতে দোষ নাই—কিন্তু সিংহকেই শক্তিরূপে যদি দেখি তবে কল্পনার মহত্ত্বই চলিয়া যায়। কারণ, যে কল্পনা সিংহকে শক্তির প্রতিরূপ করিয়া দেখায় সেই কল্পনা সিংহে আসিয়া শেষ হয় না বলিয়াই আমরা তাহার রূপ-উদ্ভাবনকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি—যদি তাহা কোনো এক জায়গায় আসিয়া বদ্ধ হয় তবে তাহা মিথ্যা, তবে তাহা মানুষের শত্রু।' এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনের একটি ঘটনাকে উল্লেখের পর তাঁর বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্মভাবনার প্রবাহ বাঙালী মানসকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত রকম সুদৃঢ় আদর্শে থেকেও পরবর্তীকালে আবার এই 'পরমহংস রামকৃষ্ণদেব'এর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি কবিতাও লিখেছিলেন—

'বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে;
দেশবিদেশের প্রণাম আনিল টানি
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।'

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের ১৩৪২ বঙ্গাব্দে রচিত এটি। রাজা রামমোহন রায় বা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিশেষ উৎসব উপলক্ষেও রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধাঞ্জলি কবিতা রচনা করেছেন। সেখানে কবির পূর্বসূরীর প্রতি এবং কবির জীবন ভাবনার অনুপ্রেরণার কেন্দ্রবিন্দুর প্রতি আস্থাই সূচিত করেছে।

অদ্বৈতবাদ বা দ্বৈতবাদ কিংবা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ কোনটায় বিশ্বাসের মৌল বিন্দু? কোনখানে জীবন ও জীবিকার, মনন ও মনীষার যথার্থ উত্তরণ? কোথায় মানসিকতার যথাযোগ্য পরিপূর্তি! প্রশ্ন মনস্কতায় অজস্র ধ্যান প্রসারিত হতে পারে কিন্তু জ্ঞানের ধন আর ধ্যানের মন এক হয় কি? তবে কি একেশ্বরবাদ নিয়েই অগ্রগতি বা নিরাকার ও আকার নিয়ে দ্বিমুখী চিন্তায় দ্বিদলের ভাবরাজ্য? উনিশ শতকে বোধ হয় আবিষ্কার হয়েছে তার মধ্য পথ আছে কি না? বা সব থেকে প্রথমে ধরার পথ হয় 'জীবে প্রেম'। 'মানুষের ধর্ম' বা মানবতাবাদই মহত্তর ও জাগতিক জীবের মানবিক ধর্ম রূপেই আত্মপ্রকাশ ঘটালো যা সংস্কারান্ধ যুগে অবহেলিত হয়েছিল। না হলে 'সবার

উপরে মানুষ সত্য' বলার মতো শক্তিধর তো আমাদের দেশেই ছিলেন। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ বা বুদ্ধদেব থেকে বিবেকানন্দ সবার আদর্শের যৌগ'বন্দু 'জীবে প্রেম'। অবশ্য পরস্পের ভিন্ন'ভঙ্গ শব্দে ও ভাষায় একক মূলভাবকেই অভিব্যক্ত করেছেন। এবং একটি সমন্বয়ী জীবনাদর্শ।

রবীন্দ্রনাথ 'সমাজ' গ্রন্থের 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে ১৩১৫ বঙ্গাব্দে লিখলেন —'অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে-মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্ত সংকুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্ত নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।' ঠিক এমনি ধারায় আবারো রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন সরসীলাল সরকারকে 'চরকা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য' শিরোনামায় ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠ মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকার পৃষ্ঠায় যা প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ সেখানে লিখেছেন—'আধুনিক কালে ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন, সেটি কোনো আচারগত নয়। তিনি দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন তোমাদের সকলেরই মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি, দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান।' এখানে রবীন্দ্রনাথ স্বীকারই করলেন যে 'এই কথাটি যুবকদের চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েচে। তাই এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্র ভাবে বিচিত্র ত্যাগে ফলেচে।' উনিশ শতকের ভাবরাজ্যে স্নাত রবীন্দ্রনাথ ৩৩৫ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনে লেখা চিঠিতে স্বামী অশোকানন্দকে লিখছেন—'কিছুদিন আগে বিবেকানন্দ বলেছিলেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি; বলেছিলেন দরিদ্রের মধ্য দিয়ে নারায়ণ আমাদের সেবা পেতে চান। এ'কে বলি বাণী। এই বাণী স্বার্থবোধের সীমার বাইরে মানুষের আত্মবোধকে অসীম মুক্তির পথ দেখালে।' এই পত্রেই রবীন্দ্রনাথ আরো লিখলেন 'এতো কোনো বিশেষ আচারের উপদেশ নয়, ব্যাবহারিক সঙ্কীর্ণ অনুশাসন নয়। ছুঁৎমার্গের বিরুদ্ধতা এর মধ্যে আপনিই এসে পড়েচে,—তার দ্বারা রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্যের সুযোগ হতে পারে বলে নয়, তার দ্বারা মানুষের অপমান দূর হবে বলে, সেই অপমানে আমাদের প্রত্যেকের আত্মাবমাননা।' রবীন্দ্রনাথের এ এক অভাবনীয় উক্তি আবার বলা যায় এ রবীন্দ্রনাথেরই উপযুক্ত উক্তি।

সবার নিচে সবার পিছে সবহারাদের মাঝে একটুখানি স্থান বা রবীন্দ্রনাথের মনে হল যেন যে কবি মাটির কাছাকাছি 'তারি লাগি কান পেতে আছি।' একটা সর্বস্তরের মানবিক বোধ নিয়ে যে সমান মর্যাদার সমাজ সেখানেই যথার্থ জগৎ ও জীবনের জয়যাত্রা। এবং 'গীতাঞ্জলি'র কবিকণ্ঠে তাই প্রথমেই বাণী উচ্চারিত হয়েছিল—'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে।' নিরাকার ধ্যানী বলে উঠলেন—কি কাণ্ড, কি কাণ্ড, সাকার বাদীর রূপকল্পনা এসে গেল যে, সর্বনাশ? কিন্তু নিরস চিত্ত বুঝলো না কবির সর্বেশ্বরের প্রতি সুগভীর আত্মনিবেদনের সমর্পিত প্রণতির যথার্থ প্রকাশভঙ্গিটিকে।

পাশ্চাত্ত্য প্রজ্ঞানের স্বীকরণ, ভারত ঐতিহ্যে আস্থা এবং স্বদেশপ্রেম জাগৃতি নিয়েই ছিল উনিশ শতকীয় মানসিকতা। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তারই প্রবক্তা। তাই রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসে বা নাটকে নবজাগৃতির জয়গান উচ্ছ্বসিত কিন্তু ঐতিহ্য-বিমুখী নয়। যিনি পরিত্রাণের দিনে আসন্ন মুক্তির বাণী শোনাচ্ছেন তিনি অন্য কেউ নন তিনি বৈরাগী বাউল বা ঠাকুরদা। তিনি জীবনের মুক্তি-বিলাসী কিন্তু সুপ্ত সংস্কৃতির পুনর্জাগৃতির দোলায় দোলায়িত। গোরা, অন্ত, এলা, সোহিনী - অনেকেই চার-দেওয়ালের বন্দীদশা পেরিয়ে যেতে চেয়েছে কিন্তু মাটির টান একটা থেকেই গিয়েছে শেষ অধ্যায়ে এসে, বোধের চরমে উপনীত হয়ে। রবীন্দ্রনাথ আসলে থাকতে চেয়েছেন মাটির কাছাকাছি যেখানে ঐতিহ্যপ্রীতির মধ্যেই স্বাধর্ম্য শতাব্দীর হাত ছুঁয়ে এগিয়ে এসেছে। যার জন্যে তিনি বলতে পেরেছিলেন—'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।' তাঁর অভীপ্সা— অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ।'

মনন-জাগৃতি ও মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত

১

'বেদ ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট নহে, বিশ্ববেদান্তই প্রকৃত বেদান্ত।'—এই কথা যিনি উচ্চারণ করেছিলেন তাঁরই জন্মের দেড়শত বর্ষ-পূর্তি দিবস সম্প্রতি উদ্‌যাপিত হয়েছে। ১৭৭২ শকের ১১ই মাঘ ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক সভায় উনিশ শতকের বাংলার বিশিষ্ট চিন্তাবিদ প্রাবন্ধিক অক্ষয়কুমার দত্তই উপরোক্ত মত ঘোষণা করলেন। এমন কথা আজও ভাবতে আমাদের অবাক লাগে অথচ সেদিনেই তিনি ভেবেছিলেন—বেদ ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট নয়। এবং সেখানেই শেষ নয়, আরো প্রসারিত বোধের আলোকে তিনি বললেন—বিশ্ববেদান্তই প্রকৃত বেদান্ত। অল্প কথা কিন্তু বৃহৎ-ব্যঞ্জনা বহুল। প্রবক্তা সম্পূর্ণ সংস্কার মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন মানসিকতার অধিকারী বলেই তো তাঁর পক্ষে এমন মত প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে ছিল। ১৭৭৭ শকের বৈশাখ সংখ্যার 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় লিখলেন—'অখিল সংসার আমারদিগের ধর্মশাস্ত্র।'

দীপাবলী সুসজ্জিত বাংলার উনবিংশ শতাব্দীটি। সেই দীপাবলীর অন্যতম দীপশিখা অক্ষয়কুমার দত্ত। রাজা রামমোহন রায় থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখদের মনীষীমণ্ডল আলোকে বিধৌত বঙ্গভূমিকে চিন্তা করতে হলে একবার অক্ষয়কুমার দত্তের বলিষ্ঠ ও ওজস্বী বক্তব্যরাজিকে অবলোকন করা যথার্থই অনুসন্ধানীর কর্তব্য। তিনি চিন্তার রাজ্যে উন্নত, যুক্তিনিষ্ঠ, বৈজ্ঞানিক এবং সংস্কারবিচ্ছিন্ন পরিমণ্ডল রচনা করেন। তিনি যেমন ভারতবর্ষীয় ঐতিহ্যপুষ্ট তেমনি আবার পাশ্চাত্ত্য নব নব চিন্তাধারায়ও অভিষিক্ত ছিলেন। তাঁর এই মানসচৈতন্য গঠনে একদিকে যেমন রাজা রামমোহন রায়ের ব্রহ্মবাদ ও সেকালীন বাঙালীর স্বদেশী ভাবনার নবজাগৃতি পরিপুষ্টি সাধন করে অন্যদিকে তেমনি হার্বার্ট স্পেন্সারের অজ্ঞেয়বাদ, জন স্টুয়ার্ট মিলের হিতবাদ বা অধিকতম জনের প্রভূততম সুখবিধানের মতবাদ এবং আগষ্ট কোম্‌তের প্রত্যক্ষবাদ ও মানবতার মতবাদ বিশেষ কার্যকরী হয়। ভারতীয় ঐতিহ্যাশ্রিত পথ অপেক্ষা তৎকালীন উনিশ শতকীয় বাংলার নবচৈতন্যের অন্যতম চিন্তাবিদরূপে অক্ষয়কুমার দত্ত পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতিই আপন দৃষ্টিকে বিশেষভাবে

প্রসারিত করেন এবং সেই পশ্চিমী সূর্যের আলোকেই বঙ্গচেতনাকে উদ্বোধিত করতে চেয়েছিলেন। 'পশ্চিমী' বলতে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানালোক বোঝাতে চাওয়া হচ্ছে অথবা বলা যেতে পারে পরিণত সূর্যের রশ্মিই বোধ হয় অক্ষয়কুমার দত্ত দেখতে পেয়েছিলেন পাশ্চাত্ত্যের গুণীজ্ঞানী মননশীল মনীষীর যথার্থ চিন্তাদীপ্তিতে।

স্বদেশ জাগৃতির এবং স্বাধীন চিন্তার ভাবরাজ্য গড়তেই অক্ষয়কুমার প্রমুখ উনিশ শতকীয় চিন্তাবিদরা চেয়েছিলন। এই চাওয়াটিতে তাঁর বিশেষভাবে যে মানসিকতা ক্রিয়াশীল তা তাঁরই একটি রচনায় উল্লেখ রয়েছে, তিনি বলছেন—'ভারতভূমি! তোমার মহিমাসূর্য্য একেবারেই অস্ত গিয়াছে। তোমার কীর্ত্তিচন্দ্র আর সঞ্চরণ করে না। কেবল তোমার ভুবনবিখ্যাত বহুমূল্য দৃশ্যমান কোহিনূরই অস্তমিত হইয়াছে, এমন নয়, তাহার বহুপূর্ব্বে চিরসঞ্চিত অমূল্য অন্তরস্থ কোহিনূর একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। দীর্ঘকায় এখন অতিক্ষীণ হ্রস্বকায়ে পরিণত হইয়াছে। কোথায় সিংহ-শার্দুলের ভয়াবহ গর্জ্জনধ্বনি, আর কোথায় ঝিল্লীগণের মৃদুমন্দ আর্ত্তস্বর। কোথায় বীরগণের বীরদর্প ও স্পর্ধা-সহকৃত সাহঙ্কার হুঙ্কার-ধ্বনি, আর কোথায় দীনহীন আশ্রিতজনের কৃতাঞ্জলিপুটে কৃপা-প্রার্থনা? সেই হিন্দু এখন এই হিন্দু!' অক্ষয়কুমার 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থে 'আর্যগণের ভারতবর্ষে প্রবেশ' অংশে এই ভাবে তিনি আপন স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যাভিমান প্রকাশ করেছেন বারংবার। তিনি বলছেন—'এক-কালের সিংহশার্দুল-প্রসবিনী ভারতভূমি এখন শশকমুষিক-প্রসবিনী হইয়া কতই লাঞ্ছিত হইতেছেন। তদীয় পূর্ব্ব প্রতাপের চিতাগ্নি হইতে কি সুদীর্ঘ শিখা ও ঘনীভূত ধূমাবলী উত্থিত হইতেছে! তাহার বর্ত্তমান অবস্থা অগ্নিময়; ভবিষ্যৎ গাঢ়তম ধূমে আচ্ছন্ন।' অক্ষয়কুমারের অন্তরে যে দেশ ও জাতির অবনতির বিষয়ে দারুণ বেদনা পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল তা নানা ভাবে ও নানা ভাষায় অভিব্যক্ত হয়েছিল দেখা যায়। তিনি ডেবিড হেয়ারের স্মরণ সভায় ভাষণ দিতে গিয়েও প্রথমেই বলেছিলেন—'যে সপ্তাহ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পরে সূর্য্য প্রকাশ হইলে চিত্ত কি প্রকার প্রফুল্ল হয়! গ্রীষ্মেতে গাত্র দাহ হইয়া পরে মন্দ মন্দ শীতল বায়ুর হিল্লোলে শরীর স্নিগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে অন্তঃকরণে কি প্রকার সন্তোষের উদয় হয়! সেই রূপ হিন্দুদিগের মলিন চরিত্রকে ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট দেখিয়া চিত্ত আনন্দে পরিপূর্ণ হইতেছে।' এই ভাষণেই উল্লেখ করেছেন যে, এখন আমরা জ্ঞানের সমাদর করি না, সত্যের প্রতি প্রীতিপ্রকাশ করি না,

কর্ম বিষয়ে উত্তর দেখাই না, বিপদ মাথার ওপর চেপে না বসা পর্যন্ত সেদিকে দৃষ্টিপাত করি না। তিনি উনিশ শতকীয় জাগৃতির বিষয়ে ঋষিসুলভ দৃষ্টিতে দর্শন করেছিলেন মনে হয় সমকালেই, তাই লিখছেন—'অভিলাষ কার্য্যেতে পরিণত হইতে লাগিল, ধর্ম্মের উন্নতি জন্য তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিতা হইল, এবং এ দেশের সুখ স্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি নিমিত্তে বেঙ্গাল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি সংস্থাপিত হইল।' ডেবিড হেয়ারের মানসিকতা বিষয়ে যে মৌল বিন্দুটি আমাদের সামনে তুলে ধরে দিয়েছিলেন তা স্মরণীয়, তিনি বললেন—'তিনি স্বদেশ হইতে ভারতবর্ষকে ভিন্ন জানিতেন না।… পৃথিবী তাঁহার জন্মভূমি, এবং সমুদয় মনুষ্য তাঁহার পরিবার।' এবং এই ভাষণে স্বল্প কথায় ডেবিড হেয়ারের অবদান বিষয়ে অকুণ্ঠভাবে ঋণস্বীকার এমন সুন্দর করেছেন যে তা সমগ্র বাঙালীর তথা সমগ্র ভারতবাসীরই পক্ষ থেকেই বলা যায়। কারণ পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের স্বর্ণদ্বার তো উন্মোচনের মহানায়ক রূপে ডেবিড হেয়ারই আমাদের মধ্যে এসেছিলেন। তাই অক্ষয়কুমার বললেন ··'এইক্ষণে আমরা যে কিছু জ্ঞান উপার্জ্জন করিতেছি, সে কেবল তাঁহারই প্রসাদাৎ।'

অক্ষয়কুমার শৈশবে কিছু ইংরিজি শিক্ষার জন্যে এক পাদ্রী সাহেবের কাছে অল্পদিন পঠনপাঠন করেন। তা বেশি দিন আর চলে নি কারণ খ্রীষ্টীয়ান হবার ভয়ে পাদ্রী সাহেবের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত করা হয় অক্ষয়কুমারকে। পরে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে পড়ার সময় আবার তিনি পেলেন সাহেব শিক্ষক। 'অক্ষয়-চরিত' গ্রন্থে নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস লিখেগিয়েছেন যে—'হার্ডম্যান জেফ্রয় নামে একজন ইংরাজ তখন গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষীয় ছিলেন। …অক্ষয়কুমার প্রাতে ও সন্ধ্যার সময়ে ইঁহার নিকট কিছু গ্রীক লাটিন হিব্রু ও জর্ম্মণ ভাষা অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। পঠদ্দশায় ইনি প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি বীতরাগ হন। ইলিয়ড, বর্জ্জিল, পদার্থ-বিদ্যা, ভূগোল, জ্যামিতি, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, উচ্চ অঙ্গের গণিত শাস্ত্র, বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান ও ইংরাজী সাহিত্য বিষয়ক ভাল ভাল গ্রন্থ অল্প বা বিনা সাহায্যে অধ্যয়ন করেন। বিজ্ঞানের প্রতি ইঁহার স্বতঃসিদ্ধ অনুরাগ ছিল।' এর আগে তাঁর সংস্কৃত পাঠ নিতে হয়েছিল টোলে এবং মুন্সীর তত্ত্বাবধানে পার্সি শিক্ষাও আরম্ভ হয়েছিল। ভাষাশিক্ষা ও বিজ্ঞানশিক্ষা নিয়ে যিনি জীবনের প্রাথমিক স্তরে এগিয়ে ছিলেন তিনি কুসংস্কারের কুঝটিকা জাল মুক্ত করে এক পরিচ্ছন্ন বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে পূর্ব ও পাশ্চমের সঞ্চিত দর্শন, ধর্ম ও জীবনধারায় মননপরিচালিত করার কথাই চিন্তা

করতেন। তাই তিনি শুধুমাত্র ঐতিহ্যাশ্রিত পথটিকেই ধ্রুবজ্ঞানে গ্রহণ করতে পারেন নি। তাই জন্তেই তো তিনি স্পষ্টভাষাতেই লিখলেন—'গগনস্পর্শিবৎ হিমালয় ও আর্য্যাবর্তের বপ্রবিশেষ বিন্ধ্যাচল যাহাদের বল ও বিক্রম, বীর্য্য ও উৎসাহ এবং ধর্ম্ম ও প্রতিষ্ঠা রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই, সেই মহাপুরুষের বংশে এখন এই অধম পামর-স্বরূপ আমরাই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। তাহাদের শোনিতকণা হিন্দুজাতির রক্তশিরা হইতে একেবারেই অন্তর্হিত হইয়াছে। তদীয় চিতাভস্মকণাও বিদ্যমান নাই। সেই সমস্ত পুরাতন মহত্তর পদার্থ একেবারেই অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।' তখন তিনি এই অবস্থা থেকে উন্নতির পথনির্দেশক একমাত্র নীতিজ্ঞান করলেন এইভাবে, জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে তখনই ইংরিজি পড়াশোনার প্রয়োজন কিন্তু প্রাচ্য-ঐতিহ্য এবং স্বদেশী ভাষা পরিহার করে নয়।

'অক্ষয়কুমার স্বদেশীয়দিগকে গম্ভীর ভাষায় গভীর বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য সমুত্থিত হইলেন। তিনি কল্পনার শরণাপন্ন হইলেন, কল্পনা তাঁহার প্রশস্ত মনোমন্দির অপূর্ব্ব ভাষারাশিতে সজ্জিত করিল।' রজনীকান্ত গুপ্ত তাঁর রচনার আরম্ভই করেছিলেন এই ভাবে—'অক্ষয়কুমার দত্ত অসামান্য প্রতিভাশালী পুরুষ। মস্তিষ্কের শক্তিতে এবং হৃদয়ের উদার ভাবে, তিনি নিঃসন্দেহ অক্ষয় কীর্তির অধিকারী হইয়াছেন। নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা সৌভাগ্যে তাঁহার কালাতিপাত হয় নাই। নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে তাঁহার জন্ম হয়।' সেই পল্লীর নাম চুপী। 'অক্ষয় চরিতে' বলা হয়েছে—'পূর্ব্বে নদিয়া এক্ষণে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত পূর্ব্বস্থলী গ্রামের সন্নিকট' এবং সেই চুপীর বাসস্থল নাকি নদীগর্ভে বিলীন।

অক্ষয়কুমারের জীবন ও মনন, কর্ম ও কীর্তি আলোচনা করে গ্রন্থ ও প্রবন্ধ অনেকেই লিখে আসছেন। ১৩০২ সালে ভট্টাচার্য এণ্ড সন্ প্রকাশ করেন 'তিন আনা সংস্করণ 'কল্পতরু' গ্রন্থাবলী নং ৩৮' যার লেখক শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী এবং যিনি আরম্ভেই লিখেছেন—'মানুষ আপন চেষ্টায় কতদূর লেখাপড়া শিখিতে এবং জ্ঞান লাভ করিতে পারে, অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাহার একটা অতি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ইচ্ছা করিলেই মানুষ যে জগতে বড় হইতে পারে—জ্ঞানী হইতে পারে, অক্ষয়কুমার নিজের কার্য্যদ্বারা তাহা প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন।'

এমনি ভাবে অনেক আলোচনার পর একটা অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে যা পাঠ করলে আমাদের চমক না লেগে যায় না। যিনি বৈজ্ঞানিক নব নব যুক্তির ওপর নির্ভর করে চলতেন তাঁর জন্মের দৈবিক কাহিনী পড়লে মজাই লাগবে। সেখানে বলা হয়েছে— চুপী গ্রামের কাছে ব্রাহ্মণীতলায় এক মহারাষ্ট্রীয় সাধুর খুব নামডাক ছিল। অক্ষয়কুমারের মা দয়াময়ী পুত্রলাভের আশায় তাঁর কাছে ধন্না দিলেন। তখন সেই সাধু যজ্ঞের পায়স প্রদান করার পর দয়াময়ীর গর্ভে এলেন যিনি, বলা হয়েছে তিনিই অক্ষয়কুমার। এর আগে চারটি সন্তান অকালে মারা যায় বলেই ১২২৭ সালের পয়লা শ্রাবণে যাঁর জন্ম হল তাঁর নাম রাখা হয় অক্ষয়কুমার। মা যে ছেলেকে খুবই আতুআতু পাতুপাতু করে লালন পালন করছিলেন সে বিষয়েও একটা ঘটনার উল্লেখ তাঁর দু'একজন জীবনীকার করেছেন। অক্ষয়কুমার শিশু বয়সে বাড়ির অন্যান্য ছেলেদের মতো পাঠশালায় গিয়ে পড়ার জন্যে বিশেষ আগ্রহী হয়েছিলেন অথচ মা তাঁর নয়নের মণিকে চোখের আড়াল করতে চান না। অর্থাৎ পাঠশালায় যেতে দিতে চাইছিলেন না। তাই সেই বয়সেই অক্ষয়কুমার অবাক হয়ে বললেন—'সকল ছেলের মা-বাপ ছেলেকে বলে পাঠশালায় যা, আর আমার মা আমাকে বলে ঘরে থাক।' আবার যখন তাঁর বাবা পীতাম্বর দত্ত পরলোকগমন করলেন তখন মায়েরই আদেশে তাঁকে উনিশ বছর বয়সে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর অর্থোপার্জনে মন দিতে হয়।

তাঁর তখন থেকেই শুরু হয়ে যায় নানা বিষয়ে পঠনপাঠন এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্যে ভ্রমণ। এ প্রসঙ্গে রজনীকান্ত গুপ্ত যথার্থই বলেছিলেন —'তিনি বিবিধ বিষয়ক গ্রন্থসমূহ হইতে যেরূপ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ নানাস্থানে গমন করিয়া, নানা বিষয় দেখিয়া জ্ঞানের সম্প্রসারণে অগ্রসর হইয়াছেন।' তাঁর জাড়তোতো দাদা হরমোহন ভাইকে আইন পড়াতে চেয়ে ছিলেন কিন্তু তিনি তাতে সম্মতি না দিয়ে বলেছিলেন—'যে বিষয় পরিবর্তনীয়, তাহা শিক্ষা করিলে লাভ কি?' শাশ্বত শিক্ষার পথেই অক্ষয়কুমারের ছিল মনের গতি। পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞান এবং দেশের ধর্মদর্শন নিয়ে চললো তখন থেকেই তাঁর সুগভীর অনুধ্যান।

জীবনীপাঠের ফলে যা জানা যায় তাতে মনে হয় তাঁর নিজের পাঠে অদম্য উৎসাহ এবং চিন্তার স্বচ্ছতার ফলে তিনি তাঁর সমকালের বিদগ্ধমণ্ডলীর আদরণীয় পুরুষ হয়েছিলেন। দর্জিপাড়ায় নরনারায়ণ দত্তের বাড়িতে 'বাঙালা

ভাষানুশীলনী সভা' ছিল এবং বরাহনগরে বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরীর বাড়িতে 'নীতি তরঙ্গিনী' সভা ছিল। এই দুই সভারই সভ্য মনোনীত হয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও অক্ষয়কুমার দত্ত। নানাবিধ বিষয়ে আলাপ-আলোচনায় এমন একটা মানসিকতার প্রভাব অক্ষয়কুমারের ওপর সঞ্চারিত হয় যা তাঁর সমগ্র জীবনকেই আলোকিত করে। এইখানেই ঈশ্বরচন্দ্রর সঙ্গে নিকট সান্নিধ্যে আসার সুযোগ ঘটে বেশিমাত্রায় যদিও তাঁর দাদার বাড়িতে থাকার সময়েই মৌখিক আলাপটুকু হয়েই ছিল গুপ্ত কবির সঙ্গে। পরে হঠাৎ একদিন 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রের সম্পাদকীয় দপ্তরে উপস্থিত হতেই গুপ্তকবি অক্ষয়কুমারকে ইংলিশ ম্যান্ পত্রিকার একটি সংবাদের কিছুটা বাংলায় অনুবাদ করতে অনুরোধ করেন। অতি সংকোচে বাংলা গদ্যে অক্ষয়কুমার সেই অনুবাদ করেন এবং গুপ্তকবির প্রশংসা লাভ করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে এর আগে 'অনঙ্গমোহন' নামে একটি মাত্র পদ্যপুস্তিকা অক্ষয়কুমার রচনা করেন। তখনও তিনি গদ্য লেখক হন নি। তাই 'অক্ষয় চরিতে' বলা হয়েছে—'যে ওজস্বিনী গদ্যরচনায় দত্ত মহোদয় অখিল বঙ্গদেশকে বিমোহিত করেন, এই সেই গদ্যরচনার সূত্রপাত।' এই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই অক্ষয়কুমারকে নিয়ে এসেছিলেন তত্ত্ববোধিনী সভায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন এবং ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর সভ্য শ্রেণী ভুক্ত হন। এর পরই অক্ষয়কুমার বিশেষ বরণীয় সুযোগ লাভ করলেন যখন তত্ত্ববোধিনী সভা এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আহ্বান করলে। বিষয় ছিল 'বেদান্তানুযায়ী সন্ন্যাস ধর্ম্ম ও সন্ন্যাসীদিগের প্রশংসা'। তিনিই হলেন প্রথম। প্রতিযোগিতার সর্তানুযায়ী 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রথম সম্পাদক রূপে অভিষিক্ত হলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। ১৮৪৩ থেকে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি মোট বারো বছর সম্পাদক ছিলেন। এইখানেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটলো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের। এর আগে 'বিদ্যাদর্শন' মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেছেন অক্ষয়কুমার, তখন তিনি তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষক। এই 'বিদ্যাদর্শন'এর অবশ্য মাত্র ছটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সে যাই হোক অক্ষয়কুমার 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ায় দুটি পত্রিকায় সম্পাদনা করার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষকতায় ও বিদ্যাসাগরের ইচ্ছায় কলকাতা নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত হবায় সুদুর্লভ যোগাযোগগুলো হয়। কিন্তু দীর্ঘ দিন তাঁর এই

সব কাজ করা সম্ভব হয় নি। তাঁর প্রধান অন্তরায় হয়েছিল শারীরিক অসুস্থতা যাকে তাঁর জীবনীকাররা বলেছেন শিরোরোগ।

'অক্ষয়বাবু একজন অনুধ্যানশীল ব্যাক্তি। স্বদেশের ও স্বজাতির হিতাহিত চিন্তা সর্ব্বদাই ইহাঁর অন্তঃকরণে জাগরূক আছে। এই উদ্দেশ্য ব্যতীত একটি পঙ্‌ক্তিও ইঁহার লেখনী হইতে কখন বহির্গত হয় নাই। বস্তুতঃ ইনি কোন বিশেষ হিতকর প্রয়োজন ও গুরুতর অভিসন্ধি ব্যতিরেকে কোন গ্রন্থই লিখেন নাই।' তাঁর জীবিতকালে প্রকাশিত মহেন্দ্রনাথের বৃত্তান্তের এই অংশটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং তাঁর মানসিকতার উপলব্ধিতে বিশেষ সহায়ক। অনেক সময় জীবনের আসল দিকটিই আমাদের চোখে ধরা দেয় না কিন্তু যথার্থ জীবনীকার তাই পাঠকের সামনে তা তুলে ধরেন।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' চতুর্থ ভাগ ৮৫ সংখ্যার ১৭ পৃষ্ঠায় 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' আলোচনায় 'ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে মনুষ্যের কত দুঃখ হয় তাহার বিচার' অংশে বলছেন—'বাহ্য বস্তুর সমুদায়ের যেরূপ শৃঙ্খলা ও আমাদের মনের যেরূপ প্রকৃতি, তাহাতে সমুদায় মনোবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া তদনুযায়ি ব্যবহার করিলেই সুখ স্বচ্ছন্দ লাভ হয়, আর তাহার অন্যথাচরণ করিলেই দুঃখ ঘটনা হয় যেস্থলে অন্যান্য মনোবৃত্তির সহিত বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির বিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্থলে শেষোক্ত প্রধান বৃত্তিদিগেরই উপদেশ গ্রহণ করা আবশ্যক। বুদ্ধি-বৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির অমৃতময় উপদেশ গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ি আচরণ করিলে অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয়; আর তাহার বিরুদ্ধ ব্যবহার করিলে সেই অতুল আনন্দ লাভে বঞ্চিত হইতে হয়, এবং আন্তরিক যন্ত্রণা ও সাংসারিক ক্লেশ ভোগ করিতে হয়।' ১৯ পৃষ্ঠায় আরো সুন্দর করে এবং স্পষ্ট করে বলা হল—'শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ন্যায় মনোবৃত্তিরও তেজোবাহুল্য এবং ঔৎসুক্য সহকারে চালনা এই উভয়ই আমাদের সুখের কারণ।' মনীষী অক্ষয়কুমার দেহ ও মন, জীবন ও আদর্শ সব কিছুকেই কেমন সহজ সুন্দর রূপরীতিতে আচরণীয় তারই অভিব্যঞ্জনা দান করেছেন। মনোদর্শনের সূক্ষ্মবিশ্লেষণধর্মী প্রাজ্ঞপুরুষের পূর্বসূরি তিনি। সাহিত্যের ভাষায় তিনিই তো আমাদের মনের কথা বললেন। একটা রূপকের আবরণে আবৃত করে নিয়ে বলা কথা। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র চতুর্থ ভাগ ৮৯ সংখ্যার ১৪৭ পৃষ্ঠায় 'স্বপ্ন দর্শন' রচনায় বলা হল—'মনোমধ্যে যে বিষয়ের আন্দোলন করা যায়, স্বপ্নাবস্থায় তাহাই বা তদনুযায়ি ব্যাপার সমুদায় দৃষ্ট হইয়া থাকে

একথা যথার্থ বটে। গত কল্য সমস্ত দিবস বহু ক্লেশে স্বকার্য্য সাধন পূর্ব্বক অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও কিঞ্চিৎ বিরক্ত ভাবাপন্ন হইয়া রজনী যোগে সংসার যাত্রা ও মানব চরিত্রের বিষয় বিবেচনা করিতে ছিলাম।' মনের বিশেষ ভাবকে উপলব্ধি। আবার দূরবীক্ষণ সাহায্যে আকাশের জ্যোতির্মণ্ডল নিরীক্ষণ করারও তাঁর সখ ছিল। 'স্বপ্নদর্শন—বিদ্যাবিষয়ক' রচনায় বোধ হয় তাই প্রকাশ করেছেন —'আকাশমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে করিতে, জগতের আদি-অন্ত, কার্য্য-কারণ, সুখদুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম সমুদয় মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতেছিলাম।' তাঁর জীবন-বৃত্তান্তে পাওয়া যায় যে মধ্যরাত্রিতেও তিনি আকাশের তারা নিরীক্ষণ করেছেন যার ফলে বহুবারই স্ত্রীর বিশেষ ক্ষোভ ও অভিমানের কারণস্বরূপ হয়েছেন।

অক্ষয়কুমার তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টিতে পত্রিকা সম্পাদনা ও শিক্ষকতার কাজেই অতিবাহিত করেন ঠিকই কিন্তু 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থের মতো বিষয়বস্তুর সংগ্রহের কাজেও যে জীবনের অনেকটা অংশই তাঁকে অতিবাহিত করতে হয়েছিল তা তাঁর নিজের উক্তিতেই পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ভাগের উপক্রমণিকাংশে তিনি বলেছিলেন যে—'বাঙ্গালাদেশের অধিক লোকই শাক্ত। এখানে তন্ত্র-শাস্ত্রেরও অপ্রতুল নাই। অতএব শাক্ত-ধর্ম্মের বিবরণ সংগ্রহ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। শৈব সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত-সংগ্রহ উদ্দেশে ন্যূনসংখ্যা ১৪০০ চৌদ্দশত শৈব উদাসীনের ব্যবহার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, বহু শতের সহিত ব্যাপককাল একত্র সহবাস করিয়া তাহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান সংক্রান্ত নানা বিষয়ের কথোপকথন করিয়াছি এবং সজ্জন সরল-স্বভাব উদাসীন পাইলে নিজ গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক তদীয় মতামত শিক্ষা ও ক্রিয়ানুষ্ঠান দর্শন করিয়াছি। ঐ উদ্দেশে তাদৃশ সংখ্যক বৈষ্ণব উদাসীনেরও আচার-ব্যবহার অবলোকন ও তাহাদের সহিত সংসর্গ ও সদালাপ করিতেও ত্রুটি করি নাই।' তাঁর জীবনের আর একটি অধ্যায়ে এসে কি গভীর বেদনার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে যখন তিনি লিখছেন—'যাহার হস্ত পুস্তকালঙ্কারে অলঙ্কৃত না হইয়া একদণ্ড কাল অতীত হইত না, এখন বৎসর বৎসর ও যুগ-যুগান্তর তদ্ব্যতিরেকে অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে। ষোড়শ বা সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে রীতিমত শিক্ষারম্ভ করিয়া, পঁইত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম অতীত না হইতেই, দুর্জ্জয় রোগ প্রভাবে চিরদিনের মত অসমর্থ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলাম।'

এই রকম শারীরিক অবস্থার কথা জেনে তত্ত্ববোধিনী সভায় কানাইলাল পাইন প্রস্তাব করেন অক্ষয়কুমারকে মাসিক বৃত্তি প্রদানের। ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগরও এই বিষয়ের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন শোনা যায়। কিন্তু তা আর বেশিদিন গ্রহণ করেন নি অক্ষয়কুমার কারণ তাঁর গ্রন্থাদি বিক্রয়ের আয় থেকে সংসার চলার মতো সংস্থান হয়েছিল সচ্ছল। তিনি তখন বালিতে 'শোভনোদ্যান' নামে এক বিঘে জমির ওপর একটি আশ্রম কুঠিরই বলা যায় নির্মাণ করে বসবাস করেছিলেন :

এই উদ্যান গৃহেই ২৮ মে ১৮৮৬ বা ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩ বঙ্গাব্দে তিনি পরলোকগমন করেছিলেন।

৩

অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন ও কর্মের বিশিষ্টতম অধ্যায় কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সাহচর্যে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'য় প্রবেশ এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংস্পর্শে আসা। এক কথায় বলা চলে তিনি সেদিনই কলকাতার তৎকালীন অভিজাত জ্ঞানীগুণী সমাজেই প্রবেশলাভ করেছিলেন এবং দীর্ঘ বারো বছর ধরে তিনি এই সভার মুখপাত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সম্পাদনা কর্মে নিযুক্ত থেকে নিজে যেমন বিভিন্ন বিষয়ে বাংলা প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করেন তেমনি বিদগ্ধজনের কাছ থেকে রচনা আমন্ত্রণ করে একটি প্রজ্ঞাদীপ্ত মননশীল পত্রসম্পাদনারও ঐতিহাসিক অবদান রাখেন। এখানে কথাটি এই কারণেই উচ্চারণ করা হল কারণ তখন বাংলা সাময়িক পত্রসম্পাদনের ক্ষেত্রে সবে মাত্র ক্রান্তিরেখা সূচিত হচ্ছে।

অক্ষয়কুমারের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সম্পাদন বিষয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'আত্মজীবনী'তে বলেছেন—'তিনি যাহা লিখিতেন তাহাতে আমার মতবিরুদ্ধ কথা কাটিয়া দিতাম এবং আমার মতে তাঁহাকে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতাম। কিন্তু তাহা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ, আর তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ। আকাশ পাতাল প্রভেদ।'

মহর্ষির এই উক্তিতেই যথার্থভাবে অক্ষয়কুমার দত্তের একদিকে যেমন ব্যক্তিচৈতন্যের পরিচয়টি পাওয়া যাচ্ছে এবং সমকালীন বিশিষ্টজনের মধ্যে তাঁর ব্যক্তি আসনটি যে কত সম্মানের ও সমাদরের বস্তু ছিল তারও পরিচয় লাভ করা সম্ভব হচ্ছে। অক্ষয়কুমার দত্ত 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির

সম্বন্ধ বিচার' গ্রন্থের প্রথম ভাগের 'বিজ্ঞাপন' অংশের শেষে লিখেছেন— 'অবশেষ, সকৃতজ্ঞ চিত্তে অঙ্গীকার করিতেছি, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েরা বহু পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক এই গ্রন্থ সংশোধন বিষয়ে বিশিষ্টরূপ আনুকূল্য করিয়াছেন। তাঁহারা এবং তাদৃশ অন্যান্য সদ্বিদ্যাশালি বিচক্ষণ ব্যক্তি গ্রাহ্য করিয়াছেন বলিয়াই, আমি ইহা প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি।'

অক্ষয়কুমারের সমস্ত জীবনধারায় নানা বিপর্যয় দেখা যায় আবাল্যই। তাই আজকের তাঁর উত্তরপুরুষদের মনে হতে পারে যে, তিনি যা সৃষ্টি করে গিয়েছেন তার থেকেও তিনি মহত্তর মনীষার অধিকারী ছিলেন। তাঁর সেই মহৎ মহীয়ান স্বরূপটি আমাদের কাছে পূর্ণাঙ্গ রূপে উদ্ঘাটিত হয় নি কেবল পাঠ্যপুস্তকের আধারে তার পরিচিতি পরবর্তীকালের সাহিত্যপাঠকের কাছে পৌঁছিয়েছে। 'স্বপ্নদর্শন—বিদ্যাবিষয়ক' নিবন্ধটিকে কেন্দ্র করে প্রবেশিকা পরীক্ষার সময় ছাত্ররা নানা প্রশ্ন তৈরি করতেন আর বর্তমান বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ কালে বাংলা গদ্যের অন্যতম রূপকার প্রাবন্ধিক-রূপে তাঁর পরিচয় লাভ করছেন। কিন্তু তাঁর 'চারুপাঠ' গ্রন্থের তিন খণ্ডের অন্যান্য জ্ঞানগর্ভ অথচ সরস নিবন্ধগুলোর পঠনপাঠন হয় না। ১৭৭৪ শকাব্দের ৪ঠা শ্রাবণ অক্ষয়কুমার 'চারুপাঠ' প্রথম ভাগের 'বিজ্ঞাপন' অংশ রচনা করে লিখেছিলেন— 'যেরূপ প্রস্তাব পাঠ করিলে, করুণাময় পরমেশ্বরের বিশ্বকার্য্য-সম্বন্ধীয় নানাবিধ বাস্তবিক বিষয়ের জ্ঞানলাভ হইতে পারে, তাহাই ইহাতে নিবেশিত হইয়াছে। এ সকল বিষয়ের আলোচনা, অকিঞ্চিৎকর কাল্পনিক গল্প পাঠ অপেক্ষা সমধিক কল্যাণকর, তাহার সন্দেহ নাই।' এই সূত্রে দ্বিতীয় ভাগের 'বিজ্ঞাপন' অংশের দিকে দৃষ্টি রাখলে আরো স্পষ্ট করে তাঁর প্রচেষ্টার সার্থকতা উপলব্ধি করা যায়। তিনি লিখছেন—'এতদ্দেশীয় সংস্কৃত-ব্যবসায়ী পণ্ডিত মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকে কেবল অবাস্তব উপাখ্যান অধ্যয়ন করাইতেই ভালবাসেন; বিশ্বের নিয়ম ও বাস্তব পদার্থের গুণাগুণ শিক্ষা করাইতে তাদৃশ অনুরক্ত নহেন। ...বোধ হয়, ভাষা-শিক্ষা-সহকারে প্রাকৃত পদার্থ ও প্রাকৃতিক নিয়ম শিক্ষা করা যে বালকগণের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক, ইহা এক্ষণে অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে।' এর পরই তাঁর চিন্তা ছিল যে, শিক্ষকের শিক্ষাও এ বিষয়ে কি হয়েছে? উপযুক্ত শিক্ষকও প্রয়োজন যা তখন দুর্লভ হয়েছিল।

এখানে আজ আক্ষেপই হবে যে, 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ

বিচার' দুইভাগে প্রকাশিত গ্রন্থের পুরানো পাতাগুলো প্রাচীন কোনো পাঠাগার থেকে নিয়ে কেউ আর উল্টেপাল্টেও দেখি না। এই গ্রন্থেরই প্রথম ভাগের 'বিজ্ঞাপন' অংশে অক্ষয়কুমার লিখেছিলেন—'দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া সুখ বৃদ্ধি হয় ইহা সকলেরই বাঞ্ছা, কিন্তু কি উপায়ে এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে তাহা সম্যক রূপে অবগত না থাকাতে, মনুষ্য অশেষ প্রকার দুঃখ ভোগ করিয়া আসিতেছেন। অতি পূর্ব্বাবধি নানা দেশীয় নীতি-প্রদর্শক ও ধর্ম্ম-প্রযোজক পণ্ডিতেরা এবিষয়ে বিস্তর উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।' দ্বিতীয় ভাগের 'বিজ্ঞাপন' অংশে লিখছেন—'এই গ্রন্থে যে সমস্ত সর্ব্বশুভদায়ক বিষয়ের বিবরণ করা গেল, যখন বিদ্যালয় সমুদায় সেই সকল বিষয় অধ্যয়ন অধ্যাপনার স্থান হইবে, যখন ধর্ম্মোপদেশকেরা পরমেশ্বরের এই সমস্ত প্রিয় কার্য্যকে তাঁহার উপাসনার অঙ্গ বলিয়া উপদেশ প্রদান করিবেন, এবং সাংসারিক আচার ব্যবহার ও বিষয়-চেষ্টা নিরবচ্ছিন্ন নৈসর্গিক নিয়মানুসারে সম্পন্ন হইয়া বিষয়কার্য্য এবং জ্ঞান ও ধর্ম্মানুষ্ঠান একীভূত হইয়া যাইবে, তখন মনুষ্যনামের গৌরব রক্ষা পাইয়া উত্তরোত্তর তাঁহার পূর্ণাবস্থা সম্পন্ন হইতে থাকিবে।' কলকাতায় অক্ষয়কুমারের এই দুটি উক্তি যথাক্রমে শকাব্দ ১৭৭৩ পৌষ ৮ই এবং ১৭৭৪ মাঘ ১০ই তারিখের। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের 'যত মত তত পথ' বা বিবেকানন্দের 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর' বলার পূর্বের প্রকাশ। একটা মানবতার গৌরব জাগৃতির মানসিকতা। রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্ম' এই বোধকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রাক কথন।

অক্ষয়কুমারের 'ধর্মনীতি'—সেকালের বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থটিরও সঙ্গে কি আমাদের পরিচিতি ঘটেছে—কৈ শুনি না তো? 'পদার্থবিদ্যা' এই নামে অক্ষয়কুমারের গ্রন্থটিরও কি সন্ধান রেখেছেন আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানীর বাঙালী ছাত্ররা? তাঁর 'বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ' বা 'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার' নামের গ্রন্থও যে তিনি রচনা করেছিলেন সে কথা তাঁর উত্তরসূরিদের বিশেষ জ্ঞাতব্য। তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' গ্রন্থটির তিনি দুই ভাগ প্রকাশ করেছিলেন তার তৃতীয় ভাগের কাজ আরম্ভ করেও শেষ হয় নি বলেই জানা যাচ্ছে। সে সময় তিনিই বাংলা ভাষায় 'ভূগোল' গ্রন্থরচনা করেছিলেন। তার ভূমিকায় তিনি লিখছেন—'এ অকিঞ্চন হইতে কিঞ্চিৎ দেশের উপকার সম্ভবে, এই মানস করিয়া

চন্দ্রসুধালোভী উদ্বাহু বামনের ন্যায় দীর্ঘ আশায় আসক্ত হইয়া বহুক্লেশে বহু ইংরাজি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বালকদিগের বোধগম্য অথচ সুশিক্ষাযোগ্য এই ভূগোল পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছি।'

অক্ষয়কুমার দত্তের বিষয়ে বিচার-বিবেচনা করতে হলেই মনে আসে তাঁর সৃষ্টির মৌলবিন্দুটিকে কারণ তাঁর সৃজনক্ষমতা বা মননশীলতা, তাঁর ভাষার সুচারুতা বা ওজস্বিতা—সব মিলিয়ে বেশ একটা রসগ্রাহী ও সংবেদনধর্মী বর্ণনাভঙ্গিমা আছে অথচ তিনি যা লিখেছেন তার পরিকল্পনায় নিজস্ব কৃতিত্ব কিন্তু তথ্যের ক্ষেত্রে অন্যভাষার গ্রন্থেরই ওপর নির্ভরতা। এখানে অকপটে স্বীকার্য যে তখন অনুবাদ বলে যদি কিছু করা যেতো তা হয় তো চল্‌তো না কারণ তা গ্রহণ করার সে মন কি বাঙালীর ছিল? তখন কতটুকুই বা বাংলা পঠনপাঠন চালু হয়েছে? সবে আরম্ভ বলা যায়। তাই ভাবকে নিয়ে ভাবান্তরে গিয়ে অক্ষয়কুমার ভূমি থেকে ভূমায় উত্তরণ ঘটিয়েছেন প্রতিটি তাঁর রচনায়। তাঁর প্রকাশভঙ্গি, তাঁর ভাষার গঠন, তাঁর উদাহরণ উপস্থাপন সব কিছুর মধ্যেই ছিল নিজস্ব সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে কি অবস্থায় তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন তা প্রথম ভাববার কথা। তখন যা লিখছেন তাই নতুন কথা বাংলা ভাষায়। আর যা বলছেন তাই হয়ে যাচ্ছে বাচনভঙ্গি কারণ বাংলা গদ্যরচনার অন্যতম পথিকৃৎদের মধ্যেই তো গণ্য হয়েছেন অক্ষয়-কুমার দত্ত।

অক্ষয়কুমার দত্তের প্রসঙ্গে আলোচনার সময় আমাদের সব সময়েই একটি বিষয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন যে তিনি যখন বাংলায় গদ্য লেখা আরম্ভ করেছেন তখন বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের উষাকাল মাত্র। তখন রামমোহনের গ্রন্থ, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তকের গদ্যরচনা, বাইবেল অনুবাদ, শ্রীরামপুর প্রেসের কিছু রচনা ও সংবাদপত্রের ভাষা এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' প্রভৃতির গদ্য সংবাদ মাত্র প্রচলিত হয়েছে। বিদ্যাসগর তখন তাঁর রচনার সৌকুমার্য নিয়ে লেখনী ধারণ করেছেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এগিয়ে আসছেন। এমনি একটা সময়ে অক্ষয়কুমার দত্তের লেখনী ধারণ বাংলা গদ্যের উষাকালেই বলা চলে তাই তখন গদ্যের উপযোগী বাক্যবিন্যাস গঠনে একদিকে যেমন দৃষ্টি রাখতে গিয়ে সংস্কৃত শব্দ ও সমাস গঠনের প্রয়োগ করেছেন অন্যদিকে তেমনি ভূগোল, পদার্থবিদ্যা বা ধর্ম ও জ্ঞানের নানা বিষয়ক নিবন্ধ রচনার জন্যে ইংরিজি গ্রন্থের বিপুল সহায়তা নিয়েছেন। 'বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত'

গ্রন্থের ২১৭ পৃষ্ঠায় মহেন্দ্রনাথ রায় লিখছেন—'ফলতঃ স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে, ইনিই সুপ্রণালী-ক্রমে বোধ-সুলভ সরল বাঙ্গলা ভাষায় ভূগোল, খগোল, পদার্থবিদ্যা, প্রাকৃত ভূগোল, নীতি-বিদ্যা ও স্বাস্থ্য-বিধান প্রভৃতি বিবিধ বিজ্ঞান-শাখা-রচনার আদর্শ ও পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।' অক্ষয়কুমারের মূলতঃ জ্ঞান দীপিকার যে প্রবল প্রচেষ্টা তাই নানামুখী গ্রন্থরচনায় কারণস্বরূপ হয়েছিল। তাই তাঁর অনেক নিবন্ধ বা গ্রন্থকে বিদেশী গ্রন্থের অনুবাদ ঘেষা বলতে পারেন কিন্তু এই সকল আলোচনার গভীরে তাঁর মৌলিকতাই মৌলভাবে বর্তমান ছিল বাংলা গদ্যের রচনাকার রূপে। 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' গ্রন্থের প্রথম ভাগের 'বিজ্ঞাপন' অংশে বলছেন—'ইহা ইংরেজি পুস্তকের অবিকল অনুবাদ নহে। যে সকল উদাহরণ ইউরোপীয় লোকের পক্ষে সুসঙ্গত ও উপকারজনক কিন্তু এদেশীয় লোকের পক্ষে সেরূপ নহে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া তৎ পরিবর্ত্তে যে সকল উদাহরণ এদেশীয় লোকের পক্ষে সঙ্গত ও হিতজনক হইতে পারে, তাহাই লিখিত হইয়াছে।' অক্ষয়কুমার বলছেন হিতকর উদ্দেশ্যে তাঁর পরদেশীয় জ্ঞানভাণ্ডারকে স্বদেশীয়গণের দরবারে উপস্থাপনের মৌলকারণটি। এই দিক দিয়ে বিচার করলে নিঃসন্দেহে আজ বিদেশী সাহিত্যের ভাবরসের স্রোত আধুনিক বাংলা গদ্যে প্রবাহিত করার ভগীরথ রূপে যদি কাউকে চিহ্নিত করতে হয় তা হলে অক্ষয়কুমার দত্তকেই দিতে হয় সেই সম্মান। তিনি যথার্থভাবেই উদ্বোধক বাংলা উনিশ শতকীয় মননজাগৃতির।

আজ স্বামী বিবেকানন্দ তথা নরেন্দ্রনাথ দত্ত অথবা কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের গদ্যনিবন্ধ আপন সাহিত্যিক স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত হয়েছে। অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের হাতে বাংলা কবিতা ভাষা ও ছন্দের যাদুমন্ত্রে ভরে উঠেছে যে তারও মৌল প্রেরণাস্থল বা প্রাথমিক উদ্গম-স্তর ছিল বাংলা গদ্যসাহিত্যের গঠনকর্মের অক্লান্ত রূপকার অক্ষয়কুমার দত্তের গাম্ভীর্যপূর্ণ ধ্রুপদীগদ্যই। যার মধ্যে ছিল তেজোদ্দীপ্ত বাণীপ্রবাহ আবার ললিতমধুর ভাবব্যঞ্জনা।

অক্ষয়কুমারের সমগ্র জীবন নাট্যের পর্বে পর্বেই কিন্তু এই ভাবের উত্থান পতন এবং উচ্ছ্বাস ও প্রশান্তি। তিনি 'শোভনোদ্যানে' উপনীত হয়েছিলেন শেষ অঙ্কে তখন তাঁর রোগাক্রান্ত শরীর। তবে সেই সময় তাঁর উদ্যান গড়ে উঠেছিল উদ্ভিদ বিজ্ঞানীর যথার্থ সম্পদ ও সমৃদ্ধি নিয়েই যাকে বলা হত

'কনিষ্ঠ বোটানিক্ গার্ডেন'। সেদিকেরও তাঁর নতুন একটা পরিচয়ের কথা বাঙালীর কাছে অজানাই থেকে গিয়েছে। আজ আমরা দেখি ক্যাকটাস ও নানা ফুলের সুসজ্জিত উদ্যান কিন্তু তিনি নিজে কি মনোরমভাবে যে গৃহাঙ্গন সাজিয়ে ছিলেন তা আমাদের অজানাই রইল। এই প্রসঙ্গের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে ১২৮২ সালের ৯ই কার্তিকের 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল—'তিনি যে স্থানে বসেন, তাহার চারি দিকে নানা প্রকার সিন্ধু-জাত শঙ্খ, শম্বুক, প্রাণি-দেহ, জীব-কঙ্কাল প্রভৃতি অতি পরিপাটী-রূপে সুসজ্জিত দেখিলাম।' অভিজাত গৃহের ঝাড়লণ্ঠনের ঝলমলানির চেয়ে শিল্পীরুচির পরিচায়ক বলে এই গৃহ-সজ্জা স্বীকৃত হয়েছিল।

আজ মদ্যপান নিবারণ বা নিষিদ্ধ করার জন্যে আইন প্রণয়ন হচ্ছে কিন্তু দেড়শত বছর আগের এই মানুষটিই তা প্রচার করেন। ভাবতে অবাক লাগে যে রাজা রামমোহনের পর দেশ যখন জাগছে তখন এমন কথা অক্ষয়কুমার শোনালেন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' দ্বিতীয় কল্প চতুর্থ ভাগ ৮৪ সংখ্যা শ্রাবণ ১৭৭২ শকের ৫৭ পৃষ্ঠায় 'পানদোষ' প্রসঙ্গের আলোচনাটিতে বলা হয়েছে—'ইংরাজ জাতির এদেশ অধিকার হইবার পূর্ব্বে সাধারণ রূপে মদ্য ব্যবহার কতিপয় নীচ জাতির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল; কিন্তু এইক্ষণে উচ্চ শ্রেণীয় লোকেরদের মধ্যেও সুরাপান অধিক দৃষ্ট হয়; বিশেষত নব্য সম্প্রদায়ী প্রায় তাবৎ বিদ্বান্ ও ধনি যুবককে ইহাতে সাতিশয় লিপ্ত হইতে দেখা যাইতেছে। এবম্প্রকারে বিদ্বান্ বর্গের দ্বারা মদ্যের উৎকর্ষ প্রতিপন্ন হইয়া এবং ধনি বাবুদিগের দ্বারা তাহা সম্মানে গৃহীত হইয়া তদীয় সমূহ দোষ সত্ত্বেও সাধারণের আদরণীয় হইয়াছে, এবং ইহাও প্রত্যক্ষ হইতেছে, যে এই ক্ষণিক সুখদ অথচ বহু দুঃখদ গরল পানে অনেক মনুষ্য বুদ্ধি ভ্রষ্ট ও নানা প্রকারে লাঞ্ছনা বিশিষ্ট হইয়া অবশেষ ক্ষিপ্তের ন্যায় আচরণ করিতেছে।' অক্ষয়কুমার মদ্যপান নিবারণী বাণী এমনিভাবেই উচ্চারণ করেছিলেন। তাঁর স্পষ্টতা ও তীব্রতা দুই ছিল বক্তব্য কারণ তিনি যা বলছেন তা তাঁর জীবন-উপলব্ধিজাত সত্য। যুগজীবনকে তিনি যথার্থভাবেই ব্যক্তিত্ব বোধের আলোকে প্রতিফলিত করেছেন। সামগ্রিক মানবসমাজের কল্যাণমূলক চিন্তাই যেন তাঁর মধ্যে অনুরণিত দেখা গিয়েছিল। তিনি নিরামিষ আহারকেও আমাদের উপযোগী বলে মত প্রচার করেছিলেন। তিনি নতুন নতুন ভাব ও ভাবনার দ্বারা তাঁর অতি স্বল্প কর্মজীবনেই আমাদের তৎকালীন সমাজ জীবন ও মননকে উজ্জীবিত করেছিলেন। তাঁর সব থেকে চাঞ্চল্যকর

উক্তি প্রার্থনা প্রসঙ্গে। তিনি বীজগণিতের সমীকরণ-প্রণালীতে প্রমাণ করলেন এই ভাবে—'পরিশ্রম=শস্য' আবার 'পরিশ্রম ও প্রার্থনা=শস্য' কাজেই প্রমাণ হচ্ছে এই যে, 'প্রার্থনার মূল্য শূন্য অর্থাৎ কিছুই নহে।' খুবই যুক্তিযুক্ত কথা কারণ শুধু পরিশ্রমেই শস্য হচ্ছে তার সঙ্গে প্রার্থনা হলেই বা কি আর না হলেই বা কি?

৪

যে অক্ষয়কুমার দত্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে 'বড় বাবু' বলতেন তিনিই যথার্থ লিখেছিলেন—'ফলতঃ আমি তাঁহার ন্যায় লোককে পাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি। অমন রচনার সৌষ্ঠব তৎকালে অতি অল্প লোকেরই দেখিতাম।'

বাংলায় গাঢ়বদ্ধ যুক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধকার রূপে উনিশ শতকে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় পুরুষ আবার 'স্বপ্নদর্শন'এর রচনাকার রূপেও অভিনব। বিজ্ঞানের নানা বিভাগের রত্নরাজি বাংলায় পরিবেশন করলেন আবার সাধারণ ধর্ম দর্শন নীতিজ্ঞান ও আচরণবাদ সম্বন্ধেও এমন আলোচনা করলেন যা বাংলাভাষার অমূল্য সম্পদ হয়ে উঠেছিল। নীতিজ্ঞান জাগৃতি, সমাজউন্নয়ন বা সাহিত্যপ্রচার —যাই হোক না কেন সকল কিছুরই সঙ্গে তখন তাঁর সমকালে তিনি যুক্ত থাকতেন। তাঁর পত্রিকা সম্পাদনা তো সর্বজন স্বীকৃতই। ১৮১২ শকের ভাদ্র সংখ্যা দ্বাদশ কল্প চতুর্থভাগে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় 'বাঙ্গলা সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা' বিষয়ের একটি বক্তৃতা ক্রমশ প্রকাশিত হয়। সেটি দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের '৩রা আগষ্ট রবিবার এলবার্ট হলে' প্রদত্ত। সেখানে বলা হয়েছে—'কেহ কেহ বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয় বাবুকে বঙ্গীয় সাহিত্যরূপ আকাশের চন্দ্র ও সূর্য্য রূপে উল্লেখ করিয়াছেন।' এবং তাঁর সম্পাদন ভারের গুণগান করে বলা হয়েছে যে, 'ইনি তৎকালে যেরূপ যোগ্যতা এবং গভীর বিদ্যাবত্তার সহিত এই পত্রিকা সম্পাদিত করিতেন, তদ্দারা তত্ত্ববোধিনী বঙ্গবাসীর অত্যন্ত প্রীতির বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল।' এ কথার যথার্থতা আমরা মহর্ষির 'ব্রাহ্ম-সমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত' ২১ পৃষ্ঠায় পাই। সেখানে আছে—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এক সময়ে ৭০০ জন গ্রাহক ছিল; তাহা কেবল এক অক্ষয় বাবুর দ্বারা।' সে যুগে সাতশ জন গ্রাহক হওয়া কম কথা নয়। অকপটেই তাই লেখা হয়েছে যে—'অক্ষয়কুমার

দত্ত যদি সে সময় পত্রিকা সম্পাদন না করিতেন, তাহা হইলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এরূপ উন্নতি কখনই হইতে পারিত না।'

অক্ষয়কুমারের অনেক রকমের মনীষাই উনিশ শতকীয় বাংলার গর্বের ও গৌরবের। বিদ্যাসাগর যেমন সমাজসংস্কারকের ভূমিকা নিয়েছিলেন সক্রিয় ভাবে, অক্ষয়কুমারও নিয়েছিলেন লেখনীতে ও প্রতিষ্ঠানগত সদস্যরূপে। এখানে 'সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদসমিতি'র কথা বলা যায়। যেখানে বলা হয়েছিল — 'স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্ত্তন, হিন্দু-বিধবার পুনর্বিবাহ, বাল্যবিবাহবর্জ্জন এবং বহুবিবাহ-প্রচলন-রোধের নিমিত্ত সমিতির শক্তি বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হউক।' এ দিক থেকে তিনি সমাজসেবার পুরোধাপুরুষরূপে আমাদের স্মৃতিকে আন্দোলিত করতে পারেন। তাঁর স্বদেশহিতৈষী মনের কথা তো সমস্ত রচনার মধ্যেই বিধৃত হয়ে আছে।

তাঁর তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় বা কলকাতা নর্মাল স্কুলের শিক্ষকতার জীবন একটা আদর্শ শিক্ষা প্রদানের ইতিহাসরূপে ধরা যায়। কারণ বাংলায় তিনি যেসব জ্ঞানবিজ্ঞানের রচনাবলী প্রচলন করেন তা মনে হয় এই সব কর্মজীবনের সময় শিক্ষকতার কাজেও তা তাঁকে প্রয়োগ করতে হয়েছিল। সেদিক থেকে যদি আমরা বাংলায় বিজ্ঞান-দর্শন প্রভৃতি শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে অগ্রণীরূপে তাঁকে বিবেচনা করি তা হলেও খুব একটা ভুল হবে না। 'অক্ষয় চরিতে' তাই উল্লেখ করাই আছে যে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় 'অক্ষয় বাবু বর্ণমালা ভূগোল ও পদার্থবিদ্যা এই দুই বিষয়ে অধ্যাপনা করিতেন।'

আজ সব থেকে আমাদের কাছে যে কথাটা বড় করে মনে আসছে তা হচ্ছে এই, তিনি নিজের চেষ্টায় জ্ঞানের অতলসাগরে সন্তরণ করেছেন। কোনো রকম পদ্ধতি মতো বা প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষার প্রণালীবদ্ধ ধারা তাঁর শিক্ষিত মানস-গঠনে সহায়তা করে নি। তিনি জ্ঞান আহরণের অত্যুগ্র বাসনায় বিদ্যারণ্যে বিচরণ করেছেন। কারণ এর ফলে যা আসে তা তিনি জানেন—'সে পর্ব্বত এত উচ্চ যে, তাহার শিখর নভোমণ্ডলস্থ মেঘসমুদয় ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। তাহার পার্শ্ব-দেশ অত্যন্ত বন্ধুর ও দুরারোহ; মনুষ্যব্যতিরেকে আর কোন জন্তুর তথায় আরোহণ করিবার সামর্থ্য নাই।' তিনি যথার্থই তাঁর 'স্বপ্নদর্শন — কীর্তিবিষয়ক' রচনাংশে এমনি উক্তি করেছিলেন কারণ কীর্তির্যস্য স জীবতি। এবং এই জীবিত থাকাটা মননের দ্বারা। যিনি মননশীল যিনি প্রাজ্ঞ তার প্রজ্ঞানে প্রদ্যোতিত তিনিই তো সেই শাশ্বত গৌরবের অধিকারী

হন। কোনো ক্ষুদ্র সংকীর্ণ গোষ্ঠীর বা সমাজের মধ্যেই শুধু তিনি নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারেন না তিনি ভূমার মধ্যেই জীবনানন্দকে উপলব্ধি করেন। এই দিক থেকে সদ্‌গুরু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কথা স্মরণ করা যায়। তিনিও শুধু মাত্র একটি সমাজেরই প্রবক্তা মাত্র থাকলেন না, তাঁর প্রেমাদর্শ সমগ্র মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সঞ্চারিত হল। তাই অক্ষয়কুমারের জীবনের পরিণত অধ্যায় 'শোভনোদ্যানে'।

'চারু পাঠ'এর ভূমিকারূপে প্রথম ভাগের ও দ্বিতীয় ভাগের পরবর্তী সংস্করণ-গুলিতে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ১ মাঘ ১৩১৬ সালে লেখা গ্রন্থকারের জীবনী বিষয়ে জানা যায়—'বিজ্ঞান সম্মত পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ব পাঠে. মানুষের জ্ঞান যে ইন্দ্রিয়-বোধের দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং ইন্দ্রিয়-বোধেরই সমষ্টি মাত্র, এইরূপ তাঁহার ধারণা জন্মে। তত্ত্বান্বেষী অক্ষয়কুমার সুতরাং কতকটা অজ্ঞেয়বাদী হইয়া পড়িলেন। শেষ বয়সে, বোধ হয় বহু আলোচনা ও বহু দর্শনের ফলে, জগতের আদিকারণ বিশ্ববীজের প্রতি জ্ঞানযোগী অক্ষয়কুমার পুনর্বার আস্থাবান হইয়াছিলেন।'

তাই বলা যায় তিনি তাঁর কালের অপেক্ষাও অগ্রণী হন। তিনি স্বদেশকে এবং স্বজাতিকে যেমন উন্নতির মহৎ মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করেন তেমনি আবার বিশ্বের দ্বারপ্রান্তে এসে বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথাও বলেছিলেন। বলেছিলেন—'বিশ্ববেদান্তই প্রকৃত বেদান্ত।'

বঙ্কিমচন্দ্র ও আমরা

স্মৃতির দীপাবলী জ্বালিয়ে দিয়ে জাতির জীবনচর্চার মহতী অভিজ্ঞান-পত্রটিই তো রচনা হয় সব দেশের সব কালের। অসংখ্য গুণীর জ্ঞানালোকে চঞ্চলিত জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। এই ঐশ্বর্যময় ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করেই বর্তমানের চিন্তার আধুনিকীকরণের ও রূপকলার রূপান্তরেরও প্রকরণ রচিত হয়। চেষ্টা চলে স্থায়ী স্মৃতিরক্ষার যথার্থ ও যথাযোগ্য মর্যাদাসম্পন্ন প্রথায়। তাই স্মৃতিসৌধ নির্মাণ, মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা, রাস্তার নামকরণ, মহৎ ব্যক্তির নামে বক্তৃতামালার ব্যবস্থা এবং তাঁর স্মৃতিপুতঃ গৃহাদি সংরক্ষণটুকুও বিশেষ আবশ্যকীয় কর্মসূচী রূপে গৃহীত হয়। তাঁদের জীবনী ও রচনাবলী প্রকাশিত হয় সুলভ মূল্যে, তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপক স্মরণিকা পুস্তিকাও সংকলিত হয় এবং তাঁদের আদর্শভিত্তিক কর্মকেন্দ্রও গঠিত হয় কোনো কোনো সময়। এই যা কিছু বলা বা করা—এই সবটুকুই আমাদের ঐতিহ্যের মহৎ ঐশ্বর্যকে স্বীকৃতি ও সেই স্মৃতির প্রতি একান্তভাবেই শ্রদ্ধাঞ্জলি রচনা।

স্মৃতিসুখী আমরা প্রায় সকলেই। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের রচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র বললেন তাই—'সুখ যায়, স্মৃতি যায় না। ক্ষত ভাল হয়, দাগ ভাল হয় না। মানুষ যায়, নাম থাকে।'

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধেও আমাদের একটি শ্রদ্ধার হৃদয়-কমল প্রস্ফুটিত হয়ে আছে ঠিকই কিন্তু তাঁকে যথাযথভাবে সর্বদেশের ও সর্বকালের মানুষের কাছে স্মৃতির দীপাধারে প্রজ্বলন্ত রাখতে কতটুকুই বা পেরেছি? রাখতে পেরেছি কি তাঁকে আমাদের স্থায়ী গর্বের ও গৌরবের ধন বলে বিশ্বমানসিকতার সামনে তুলে ধরতে? পেরেছি কি তাঁর সমগ্র সাহিত্যকে বিভিন্ন ভাষাভাষীর মধ্যে অনুবাদের মাধ্যমে পৌঁছিয়ে দিতে? বিচ্ছিন্নভাবে এবং বিক্ষিপ্তভাবে বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়ে গবেষণা বা সমালোচনা, চিন্তা বা চর্চা হয়েছে ঠিকই কিন্তু তাঁকে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রদ্ধার ও স্মৃতির, সম্মানের ও প্রীতির মূল্যে যথার্থ রূপেও স্থাপন করা হয় নি।

তাঁকে সাহিত্যসম্রাট বলি, তাঁকে ঋষি বলি—সবটুকুই ঠিক, কিন্তু উত্তম নিয়ে তাঁর স্মৃতির স্থায়ী সৌরভটিকে যুগে যুগে কালে কালে সঞ্চারিত করার কোনো কার্যকরী করণীয় কর্তব্যই করা হয় নি। এটা হয় নি তার জন্যে আমরা যে

'আত্মবিস্মৃত জাতি'—এই আপ্তবাক্য উচ্চারণ করেই যেন স্বাভাবিক সুখ নিদ্রায় মগ্ন হই। কোনো বৃহৎ কর্মের মহৎ পরিকল্পনা নিই না, কোনো করণীয় কর্তব্য পালনের যথার্থ সংগঠন করে—এর জন্যে প্রচেষ্টাও চালাই না। নৈহাটিতে তাঁর নামে কলেজ হয়েছে বা তাঁর নামে সংগ্রহশালা হয়েছে—সবই ঠিক, বা তাঁর বলিষ্ঠভঙ্গির মর্মরমূর্তি কলকাতায় বিশেষস্থানে স্থাপিত হয়েছে এবং কলকাতার প্রতাপ চট্টোপাধ্যায় লেনের বাড়িটি সরকারী আওতায় এসেছে—সেটাও ঠিক। কিন্তু আজও কি আমাদের আরো কিছু আরেকটু কিছু করা যায় না? অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা ও চেতনাকে মৌলভাবে সামনে রেখে? আজ কি তাঁর স্বদেশ চিন্তাকে জনমানসে আবার পরিব্যাপ্ত করা যায় না? তাঁর সৎসাহিত্য ভাবনার মৌলভূমিকে চিন্তচেতনায় প্রতিষ্ঠিত করা যায় না কি? তাঁর ভাবশুদ্ধির পরিমণ্ডলে কি আমাদের বর্তমান যুগোপযোগী ভাবনার আলোকবর্তিকা প্রজ্বলিত করা যায় না? অথচ অপস্রয়মান অতীত লোকের মহৎ সম্পদই চিন্তায় ও যুক্তিতে, চেতনায় ও সাধনায় নবজাগৃতির নবীন সম্ভাবনা আনবে।

অতীতকে নিয়েই বর্তমানের অগ্রগতির সূত্ররচনা যদি হয় তা হলে বিগতের ধারাকে, স্মৃতিকে, সৌরভকে আসন্ন যুগ সভ্যতায় সঞ্চারিত করা কি যাবে না? যাবে না কি তাঁর স্থায়ী মাঙ্গলিক কল্যাণদীপ প্রজ্বলিত করা? যাবে না কি বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ ভাবনার দীপশিখাটিকে চির অম্লান জ্যোতিতে দেদীপ্যমান রাখা? আমরা তাঁর শুভ জন্মদিনের মহালগ্নের পবিত্রতায় সেই মন সেই চিন্তাই যেন করি।

তাঁর নাম মনে এলেই 'সাহিত্যসম্রাট' ও ঋষি'—এই বিশেষণসূচক শব্দ দুটি তাঁর নামের শিরোভূষণ-রূপে উচ্চারিত হয়। শুধু তাঁর নামটুকু বলার থেকে এই বিশেষণ শব্দ দুটিকে এক সঙ্গে বা যে কোনো একটিকে আগে উচ্চারণ করতেই আমরা বেশ অভ্যস্ত।

বঙ্কিমচন্দ্রকে সাহিত্যসম্রাট বলি কেন? অথবা তাঁকে ঋষিই বা বলি কেন? সবার মনেই এমনি ধারায় প্রশ্ন জাগতে পারে যে সাহিত্য সাম্রাজ্যে তাঁর সম্রাটত্ব কতখানি বা সাহিত্য-সাধনায় ঋষিত্ব তাঁর কোনখানে? এই জিজ্ঞাসাকে, এই ঔৎসুক্য ভরা প্রশ্নাবলীকে সামনে নিয়েই বলা যায় যে, নৈহাটির কাঁটালপাড়ার বিশিষ্ট চট্টোপাধ্যায় পরিবারে ১২৪৫ সাল ১৩ই আষাঢ় যে শিশুর জন্ম হয় কালে তাঁরই সৃষ্টির অভিনব প্রয়াসে বাংলা সাহিত্যের সুরসিক দরবারটি বর্ণাঢ্য

রূপ পরিগ্রহ করে এবং বাংলাভাষা তথা ভারতীয় সাহিত্যে নতুন জগতের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বাংলা উপন্যাসের প্রথম জনপ্রিয় রূপশিল্পী তিনি, সাহিত্যের আদর্শ স্থাপনের প্রবক্তা তিনি, জাতীয় জাগৃতির মহৎ মন্ত্র-উদ্গাতাও তিনিই।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র জীবনের কর্ম ও কীর্তি, মনন ও মানসিকতা বিষয়ে আমাদের নির্মল দৃষ্টির আলোকে যা মনে হয় তা হচ্ছে এই যে, তিনিই যথার্থভাবে পাশ্চাত্যের শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করেও প্রাচ্যের নবজাগৃতির আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলনের প্রস্তোতিত পুরুষ। তিনি একদিকে ইংরাজ সরকারের বিচার ও প্রশাসনে সুদক্ষ অপরদিকে আবার দেশের সাহিত্যের, ধর্মের ও ন্যায়বোধেরও পুরোধাপুরুষ। ভারতের উনিশ শতকের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক তিনি।

যখন বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত ও 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার যুগ সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব। সম্পূর্ণ প্রাথমিক স্তর থেকে একেবারে উচ্চমঞ্চের মননশীলধারার সাহিত্যরূপ বাংলায় প্রতিষ্ঠা ও প্রচলন করলেন বঙ্কিমচন্দ্রই। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি. এ. পরীক্ষায় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন দ্বিতীয় বিভাগে প্রথম স্থান অধিকারী হিসাবে বা তিনি বৃটিশ সরকারের অধীনে বাংলায় বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে দক্ষতার সঙ্গে কার্যভার বহন করেছিলেন এবং সত্যনিষ্ঠ বিচারক ছিলেন তিনি, কখনও কোনোরকম অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন নি তিনি -সে উর্ধতন সাহেবেরই হোক বা অধঃস্তনেরই হোক। এ সব গুণ তাঁর থাকবে স্মরণীয় হয়ে। ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রের ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই নভেম্বর তারিখের পৃষ্ঠায় বারুইপুরে বঙ্কিমচন্দ্রের কার্যাবলীর বিষয়ে সুন্দর সংবাদ প্রচার হয়—'বাবু বঙ্কিমচন্দ্র অভিমানের মস্তকে পদার্পণ করিয়া যথাযোগ্য ব্যক্তিগণের সহিত যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও শারীরিক কষ্টকে কষ্ট বোধ না করিয়া পীড়িত অবস্থাতেও বিচারকার্য্য সম্পাদন করেন। কার্তিকী পূর্ণিমাতে বারুইপুরে যে রাসযাত্রা হয়, তাহাতে অসম্ভব জনতার মধ্যস্থলে তিনি পদব্রজে পরিভ্রমণ করিয়া শান্তিস্থাপন ও অন্যান্য বিষয়ের তদন্ত করিয়াছেন। স্বকার্য্য বিষয়িণী কর্তব্যতা পক্ষেও ইঁহার নিকটে অনেক বিচারক পরাস্ত হন।' বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারক জীবনের ও প্রশাসক দায়িত্বের এমনি অনেক কাহিনীও নানাজনের রচনায় প্রচারিত হয়েছে।

আজ ভাবতে অবাক লাগে যে, তিনি জুনিয়ার ও সিনিয়ার বৃত্তিপরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান পাচ্ছেন, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এনট্রান্স পরীক্ষায়ও প্রথম

বিভাগে উত্তীর্ণ হচ্ছেন, বি. এ. ও বি. এল. উপাধি পাচ্ছেন সসম্মানে। অথচ তিনিই আবার শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে বলেছেন যে—'আমি আপন চেষ্টায় যা কিছু শিখেছি। ছেলেবেলা হতে কোনো শিক্ষকের কাছে কিছু শিখিনি। হুগলী কলেজে এক-আধটু শিখেছিলাম ঈশান বাবুর কাছে। ক্লাসে কখনও থাকতাম না। ক্লাসের পড়াশুনা কখনও ভালো লাগত না—বড় অসহ্য বোধ হত। কুসংসর্গটা ছেলেবেলায় বড় বেশি হয়েছিল। বাপ থাকতেন বিদেশে, মা সেকেলের উপর আর একটু বেশি, কাজেই তাঁর কাছে শিক্ষা কিছু হয় নি; নীতিশিক্ষা কখনও হয় নি।' তাঁর এই উক্তিকে বিশ্বাস করলে এ কথাই মনে হয় যে, তিনি আপন আত্মশক্তির অসীম সাধনা দ্বারাই শিক্ষাক্ষেত্রে ও সাহিত্য-চর্চায় অগ্রসর হয়ে দীপ্ত বিভায় দেশ ও জাতির সম্মানের উচ্চাসনটিকে ভূষিত করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনধারায় ও সাহিত্যকর্মে তাই আজকের যুবশক্তিরও শিক্ষণীয় রয়েছে এবং সে শিক্ষা এই যে, আপন ইচ্ছাশক্তিতে সুসংস্কৃত ও সুশোভন জীবনচর্চার অধিকারী হওয়া যায়। বিরূপ পরিবেশ ও পরিমণ্ডল থেকে নিজেকে উত্তীর্ণ করা যায় অদম্য ইচ্ছাশক্তির বলেই।

প্রত্যক্ষে না হলেও পরোক্ষেও সুশিক্ষা সঞ্চারিত হয়। সাহিত্যসাধক-চরিতমালায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে বিদ্যাসাগর ও তাঁর সমসাময়িকদের রচিত পুস্তক পাঠ করেছেন ছাত্রাবস্থায় এবং তাঁর পরীক্ষার খাতাও দেখেছেন তিনি। জুনিয়ার বৃত্তি-পরীক্ষার পাঠ্য তালিকায় বাংলা গ্রন্থ বলতে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' এবং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৭৭৪ শকাব্দা, ১০৫-১১৬ সংখ্যা) উল্লেখ দেখা যাচ্ছে। তাই বলা যায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের বাংলা গদ্যের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় ছাত্রাবস্থাতেই হয়েছিল। যদিও তাঁর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর'এরই বলা যায়। বি এ পরীক্ষায় বাংলা পাঠ্য ছিল তাঁর 'মহাভারত' প্রথম থেকে তৃতীয় পর্ব পর্যন্ত, 'বত্রিশ সিংহাসন' ও 'পুরুষপরীক্ষা' এবং এই পরীক্ষায় পরীক্ষক ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষরূপে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এনট্রান্স পরীক্ষায় তাঁর বাংলা পাঠ্য ছিল কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ' ও 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' এবং পরীক্ষক ছিলেন বিশপস্ কলেজের অধ্যাপক রেভারেণ্ট কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাথমিক স্তরের বাংলা শিক্ষার প্রসার যখন চলছে তখনই তাঁর ছাত্রজীবন গড়ে উঠছে।

বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষের নব্যশিক্ষাধারার উচ্চতম তকমাধারীর প্রথম স্তরের

পুরুষপ্রধান ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর মানসিকতায় ছিল একদিকে ব্রাহ্মণের প্রাচীন পারিবারিক আদর্শ অন্যদিকে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের উভয়কোটির বিদ্যার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র নিজের মনকে গঠন করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাই তাঁর সমগ্র জীবনধারায় অতি-আধুনিকতার যেমন কোনোরকম উচ্ছ্বাস ও আতিশয্য দেখা যায় নি তেমনি আবার সনাতনপন্থী পণ্ডিতের আচার-সর্বস্ব মানস-সম্বল মাত্র হয়েও থাকতে দেখা যায় নি। নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি ও শুভাশুভবোধের দ্বারা দেশ জাতি ও সমাজের কল্যাণবিধানে যেমন সমগ্র কর্মজীবন অতিবাহিত করেছিলেন তেমনি সৎসাহিত্যের নবসৃষ্টির লীলাতেও তিনি নিজের চিত্তানন্দের সঙ্গে সৌন্দর্যসৃষ্টির দৃষ্টি নিয়ে, সমাজ সচেতনতা নিয়ে, দেশ গঠনের মন নিয়ে, জাতিকে জাগ্রত করার মানসিকতা নিয়ে নিজের রচনাকে এবং ঘনিষ্ঠ মহলের রচনাবলীকে পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন। প্রায় শতবর্ষ আগে তিনি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। সেই সময় প্রয়োজন ক্ষেত্রে অনেকেরই রচনার ত্রুটি সংশোধন করে উৎকৃষ্ট রচনার সামগ্রী করতে কখনো তিনি কুণ্ঠিত হতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলেছেন—'এই জন্যই বঙ্গদর্শনের আমলে আমাদের বড় খাটতে হত। আমি খুব ভাল করে রিভাইজ না করে কারও কপি প্রেসে দিতাম না।' সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রের এই দিকের পরিচিতিটি আমাদের বিশেষ উপকৃত করেছে, আমাদের সম্পাদনার ক্ষেত্রে দায়িত্ববোধের শিক্ষা প্রদান করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র উনিশ শতকের বাঙালীজীবনের সর্বক্ষেত্রেরই জীবনদীপ প্রজ্বলনের উজ্জীবনী শক্তি স্বরূপ ছিলেন। তাঁর 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা যথার্থরূপে বাঙালীরই জীবনদর্শনকে প্রতিফলিতই করেছিল এবং বলা যায় প্রভাবিতও করেছিল। সেদিনের ভাবনার যে জগৎ তা যেন নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল বলা যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর সমাজজীবন থেকে যে চেতনার উদয় হয়েছে তারও সামাজিক সমস্যা নিয়ে অনেক ভাবেই সেদিনের চিন্তাবিদদের ভাবনা হয়। 'পতির অকপট শুশ্রূষা এবং বন্ধুগণের ও সন্তানগণের অনুপোষণ, ইহাই স্ত্রীলোকদিগের প্রধান ধর্ম।' বললেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি যেমন 'বন্দেমাতরম' বাণীমন্ত্রে বাঙালীজাতির সর্বাত্মক উদ্বোধন-সাধনে অগ্রণী পুরুষ হয়েছিলেন তেমনিই সমাজজীবনকে ধারণযোগ্য আদর্শকর্মের পথে সঞ্জীবিত করারও উদ্গাতা। 'কৃষ্ণচরিত্র' ব্যাখ্যায় এমন অনেক উক্তি করেছেন যা

প্রতিদিনের জাতীয় জীবনেঃই যথার্থ প্রয়োজনীয় কথা। গার্হস্থ্য সমাজের পতিপত্নী-পুত্রকন্যার মধ্যেই যে বন্ধন তার মধ্যেই তিনি সংসার-ধর্ম করা প্রধান কর্ম বলে অভিমত দিয়েছেন। একটা জানা কথাকে জানানোর মতো করে জানিয়ে দিয়ে যেন একটা ঋষিবাক্য উচ্চারণ করে গিয়েছেন। আমাদের অনেক চিরন্তন নীতিকথাকে সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে বাণীবদ্ধ রূপে দেখতে পেলে বেশ খুশির মনেই তাকে অবচেতন ভাবেও যেন সাধারণের মধ্যে অন্ততঃ কিছু কিছু জনের গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়। তখন বলা চলে যে অমুকজনের কথাটা মনে রাখার মতো। এমনিই অনেক উক্তির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তিটিও বাঙালী সমাজের বড় দরকারী কথা।

বঙ্কিমচন্দ্র মুচিরাম গুড়ের 'জীবনচরিতে' লিখলেন—'স্ত্রার নামে বিষয় করাই বেনামীর শ্রেষ্ঠ। এই এখনকার দেবত্র। আগে লোকে বিষয় করিত ঠাকুরের নামে—এখন বিষয় করিতে হয় ঠাকুরুণের নামে।' এমনি ভাবে তিনি 'ঠাকুর' ও 'ঠাকুরুণের' বিষয় নিয়ে আরো বললেন— উভয় স্থলেই বিষয় কর্তা 'সেবাইত' মাত্র— পরমভক্ত—পাদপদ্মে বিক্রীত। এইরূপ রাধাকান্ত জীউর স্থানে রাধামণি শ্যামসুন্দরের স্থানে শ্যামসুন্দরী দেবী মালিক হওয়ায় ভাল হইয়াছে, কি মন্দ হইয়াছে, জানি না—তবে একটা কথা বুঝা যায়। বিষয় হস্তান্তরের কিছু সুবিধা হইয়াছে। দধি ভোজনের পক্ষে নেপোর সুযোগ হইয়াছে।' এমন একটা নির্ভেজাল সত্যি কথা বঙ্কিমচন্দ্র অতদিন আগেই বুঝেছিলেন। সমাজের এ একটা ভয়াবহ চিত্র। এর ফলে বাঙালীর অনেক ক্ষতির পথ যে প্রশস্ত হয়েছে তাও তিনি সেদিনই তাঁর ঋষিদৃষ্টিতেই দর্শন করেছিলেন। বাঙালীর হঠাৎ বড়বাবুর দিন যে কেমন করে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তা সেদিনই তিনি উপলব্ধি করেন এবং নানাভাবে নানাদিক থেকে দেখাতে চাইছিলেন।

সমাজের প্রধান স্তম্ভ নারী। আদ্যা শক্তিও হয় তো তাই মহাদেবী রূপে কল্পিত হয়েছেন। সর্বভূতে তিনি বিরাজিতা। অথচ সমাজে সংসারে পরিবারে-পরিজনে নারীর একটা মহামহিমান্বিতা রূপই চিন্তায় থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র ছুটি উক্তিতে যে বক্তব্য রেখেছেন তাতে তাঁর উপলব্ধির প্রকাশ ভাবিয়ে তোলার মতো। আজ কর্মব্যস্ত জীবনযাত্রায় স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য বা পুত্রকন্যার প্রতি মায়ের কর্তব্য যদি যথাযথ ভাবে পালিত না হয় তা হলে সমাজজীবন তো পঙ্গু হয়ে হয়ে একটা বিশৃঙ্খলতায় পর্যবসিত হবে। সমাজের যে মৌল ভিত্তি তা তো সংসার-সমষ্টি নিয়েই।, সেই সংসারের তো মৌলবিন্দু গৃহিণী ? তাঁকে

তো সর্বদাই সজাগ ও সহিষ্ণু হয়ে সংসার তথা সমাজকেই চলিষ্ণু রাখতে হয়। সমাজে তাই নারীর স্থান আদিকাল থেকে আর আজকের আধুনিকতম কালেও সব দেশেই উচ্চতমারূপেই। সামাজিক পরিমণ্ডলে নারী হয়েছেন সর্বজনের সমাদৃতা।

বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রাচীনা ও নবীনা' রচনায় বললেন—'আমাদের শুভাশুভের মূল আমাদের কর্ম্ম, কর্ম্মের মূল প্রবৃত্তি ; এবং অনেক স্থানে আমাদের প্রবৃত্তিসকলের মূল আমাদের গৃহিণীগণ। অতএব, স্ত্রীজাতি আমাদের শুভাশুভের মূল।' এই বক্তব্যই তিনি এক কথায় 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের একজায়গায় তো উল্লেখই করেছেন—'স্ত্রীজাতিই সংসারের রত্ন।'

বঙ্কিমচন্দ্র পতির সম্পত্তিতে পত্নীর বেনামদারীর প্রসঙ্গ এনে একটা বিশেষ দিকেরই ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন। তিনি বক্তব্য রেখেছেন এইভাবে—নারী যেন বেনামী সম্পত্তি নিয়ে রক্ষা করতে পারেন না। নানালোকের লুটপাটের সুযোগ সুবিধা হয়।

কথাটা ভাববার। কারণ সে যুগে নারীর সাধারণ শিক্ষাদীক্ষা তেমন ছিল না এবং তাঁরা নিজের দায়িত্ববোধ সম্পর্কেও খুব সচেতন ছিলেন না। তবে রানী রাসমণির কথা বা রানী ভবানীর কথা এখানে ব্যতিক্রমই ধরা যেতে পারে। তেমন কজন নারী আর বাঙালী ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন ! সাধারণ গৃহস্থঘরের গৃহিণীরা অর্থ-সম্পত্তি পেয়ে তা যথাযোগ্য ভাবে রক্ষা করতে পারতেন না। অনেক সময়েই পাঁচজন জুটে গিয়ে নারীর সম্পত্তির সর্বনাশ সাধন করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমসাময়িক কালের বাস্তব বক্তব্যই বোধ হয় এইভাবে প্রকাশ করেছিলেন। সমাজে নারীর নিজস্ব আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা এবং দুষ্টজনের দ্বারা প্রলুব্ধ না হওয়ার যেন একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দিয়েছেন। নারীকে আপনার সকল কিছু নিয়েই এগিয়ে চলার দিকেই যেন তাঁর অঙ্গুলি নির্দেশ রয়েছে। কারণ তিনি জানতেন আমাদের সমাজের ভালোটা যে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার মধ্যেই রয়েছে।

'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবারে কেন নাহি দিবে অধিকার, হে বিধাতা'—রবীন্দ্রনাথের এ উক্তি এই মুহূর্তে তাই বারবার মনে আসছে, মনে আসছে বিবেকানন্দের বাণী—১৮৯৪ সালের ২৫শে মার্চ 'ভারতীয় নারী' প্রসঙ্গের বক্তৃতায় বলেছিলেন—'পাশ্চাত্ত্যের নারী হইলেন পত্নী, প্রাচ্যে তিনি

জননী। হিন্দুরা মাতৃভাবের পূজারী। সন্ন্যাসীদের পর্যন্ত গর্ভধারিণী জননীর সম্মুখে ভূমিতে কপাল ঠেকাইয়া সম্মান দেখাইতে হয়।'

আমাদের চিন্তার ক্ষেত্রে যে জাগরণ বা সংস্কার মুক্তির প্রবর্তন তা বহু মনীষীর বহুতর কর্মধারায় দিনে দিনে প্রসারিত হয়েছে। রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর যেমন এই পথের অন্যতম প্রবক্তা তেমনি নানাবিধ মৌলভাবের বা পার্শ্ববিধৃত কার্যপ্রণালীতে অনেকেরই অবদান স্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথ একদিকের, বিবেকানন্দ আর-একদিকের জাতীয় জাগরণের পুরোধাপুরুষ। মাঝখানে যাঁকে দেখি তিনি বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি আমাদের কথা বুঝলেন, তিনি আমাদের শাশ্বত মুক্তির পথ দেখতে চাইলেন—তিনি দেশের মুক্তি মনের মুক্তি সর্বদিকের মুক্তি চাইলেন। তাঁর সুদৃঢ় ও সুদূর প্রসারিত এই অনুভূতিসম্পন্ন দৃষ্টির জন্যেই তিনি ঋষিকল্প পুরুষ, তাঁর কথাকলি শুধু কথা মাত্র নয়, তা বাণী হয়ে যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র সেদিনই বুঝতে পেরেছিলেন জাতীয় প্রতিষ্ঠার মৌল ভিত্তিই যে মনুষ্যত্বে তাই বারবার তাঁর রচনায় মনুষ্যত্বের কথাই উচ্চারিত। 'কৃষ্ণচরিত্র' ব্যাখ্যায় বললেন - 'মনুষ্যের সকল বৃত্তির সম্পূর্ণ স্ফূর্তি ও সামঞ্জস্যে মনুষ্যত্ব ' মানুষের মধ্যে মনুষ্য স্বভাবগত বৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশ নিয়ে জাগৃতির কথা এসে যায়। এসে যায় জগতের সর্ববিষয়ে মাঙ্গলিকবোধের আলোকে জীবনচৈতন্যের উদ্বোধন-সাধন। 'মনুষ্যত্ব কি' বলতে গিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র বললেন—'সকল প্রকার মানসিক বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন, সম্পূর্ণ স্ফূর্তি ও যথোচিত উন্নতি ও বিশুদ্ধিই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য।' বড় সুন্দর করে কথাগুলি সাজিয়ে বলা এবং তা থাকবে সাজন্ত হয়ে শাশ্বত সাহিত্যচর্চায় ও জীবনচর্যায়।

আর একটা বিষয় আমরা অবাক হয়ে আজও শুনতে পারি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' রচনায়, যেখানে বলছেন—'অহিংসা পরম ধর্ম্ম, এ কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, ধর্ম্ম প্রয়োজন ব্যতীত যে হিংসা, তাহা হইতে বিরতিই পরম ধর্ম্ম। নচেৎ হিংসাকারীর নিবারণ জন্য হিংসা অধর্ম্ম নহে ; বরং পরম ধর্ম্ম।' অনেক, অনেক পরের এমনিই ভাবের কথায় আমরা নেচেছি, আমরা আন্দোলনে মেতেছি। অথচ কত আগেই সে কথা বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন কিন্তু আমরা তেমন করে গায়ে মাখি নি, কানেই নিই নি বোধ হয়!

বঙ্কিমচন্দ্র 'দেবী চৌধুরানী'তে খুব উজ্জ্বল ভাষায় অনেক উচ্চভাবের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন, যেখানে বলছেন—'যে-সংসারের গিন্নী গিন্নীপনা জানে, সে-সংসারে কাহারও মনঃপীড়া থাকে না। মাঝিতে হাল ধরিতে জানিলে নৌকার ভয় কি?'

মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের ঋষিদৃষ্টিকেও লৌকিক ভাষায় গিন্নীপনা বললে কি ভুল হবে ? কারণ আগাম যিনি ভালোমন্দের সব কিছুই অনুমান করে কল্যাণ বিধান করেন তাঁকেই তো আমরা কল্যাণব্রতী বলে ভাবি। তাই আমাদের জগৎ ও জীবনের যথার্থ ছবি তুলে ধরা হয়েছে দেখি ঋষির দৃষ্টির মধ্যে দিয়েই। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বঙ্কিমচন্দ্র এক কথায় অনেক কথার সুর সংহত করে বলছেন—'এ সংসারে প্রধান ঐন্দ্রজালিক স্নেহ।' স্নেহের বন্ধনটা যাদুমন্ত্রের মতো আকর্ষণ করে মানুষকে সংসারে আসক্ত থাকতে এবং অতিশক্ত থাকতে।

বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠে' যে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের চিত্র তিনি অঙ্কিত করেছেন তা ঋষিদৃষ্টির অভাবনীয় সুদূর প্রসারী প্রজ্ঞারই পরিচায়ক। সন্তানদল দেশ ও জাতির মুক্তিকামী উৎসর্গিত প্রাণ যুবগোষ্ঠী। ভারতীয় নবজাগৃতির জন্যে সাহিত্যে প্রথম ও প্রধান মহৎ পরিকল্পনা। 'দেবীচৌধুরানী' সে যুগের বাঙালী লেখকের অভাবনীয় সৃষ্টি। নারীর এমন বীরাঙ্গনামূর্তি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রেরই যথার্থ আবিষ্কার স্বরূপ। আজ আমরা দেখছি বিবাহবিচ্ছেদ প্রভৃতি নতুন নতুন আইনের আওতায় নারী সমাজের প্রগতি পরিবর্ধমান। বঙ্কিমচন্দ্রের ঋষির প্রজ্ঞালোকেও তা পূর্বেই আভাসিত হয়েছিল। তিনি 'ব্যাঘ্রাচার্য্য বিহল্লাঙ্গুল' রচনাটির মধ্যে সুন্দর রহস্যচ্ছলে বলেছেন বিবাহমন্ত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে। 'সে মন্ত্র এই রূপ—

পুরোহিত। বল, আমাকে কি বিষয়ে সাক্ষী হইতে হইবে ?

বর। আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি এই স্ত্রীলোকটিকে জন্মের মত আমার প্রভুত্বে নিযুক্ত করিলাম।

পুরো। আর কি ?

বর। আর আমি জন্মের মত ইঁহার শ্রীচরণের গোলাম হইলাম। আহার-যোগানের ভার আমার উপর ;—খাইবার ভার উহার উপর।

পুরো। (কন্যার প্রতি) তুমি কি বল ?

কন্যা। আমি ইচ্ছাক্রমে এই ভৃত্যটিকে গ্রহণ করিলাম। যত দিন ইচ্ছা হইবে, চরণসেবা করিতে দিব। যে দিন ইচ্ছা না হইবে, সে দিন নাতি মারিয়া তাড়াইয়া দিব।

পুরো। শুভমস্তু।'

অপূর্ব এক বিবাহমন্ত্রের নব-প্রবক্তা হয়েছেন তিনি এখানে একটা পরিহাস রসিক রসপ্রবাহ বহিয়ে দিয়ে। জীবনের গভীর অনুভূতির আর অনুভবের

মধ্যে দিয়েই তাঁর এই উক্তি। তিনি জাতির নানাদিককে তুলে ধরেছেন বারবার বিচিত্রভঙ্গিতে।

তাঁর সমাজমানসের উপলব্ধির পরিচয়টিও আমরা পাই যখন তিনি 'লোক-রহস্য'এর নানারচনায় তা ফুটিয়ে তুলেছেন দেখি। তিনি 'ইংরেজস্তোত্র' রচনাটির ২২ অনুচ্ছেদে বলছেন—'আমি মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া তোমার ভাষা কহিব; পৈতৃকধর্ম্ম ছাড়িয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম-অবলম্বন করিব; বাবু নাম ঘুচাইয়া মিষ্টর লেখাইব।' একেবারে পরদেহী চারিত্রিক মেজাজের যথাযথ স্বরূপলক্ষণ। কি করুণ ব্যঙ্গ তখনকার সামাজিকের প্রতি! তাঁর 'বাবু' রচনাটি তো বঙ্কিম-সাহিত্যপাঠকের জনপ্রিয়তম রচনা বলেই ধরা যায়। সেখানেও ব্যঙ্গ করেছেন তীক্ষ্ণ অস্ত্রের সাহায্যে। পাঠকের অন্তরে গভীরভাবেই বিদ্ধ হয়। তিনি বলছেন 'বিষ্ণুর ন্যায় ইঁহাদিগেরও দশ অবতার—যথা কেরাণী, মাষ্টার, ব্রাহ্ম, মুৎসুদ্দী, ডাক্তার, উকীল, হাকিম, জমীদার, সংবাদপত্রসম্পাদক এবং নিষ্কর্ম্মা।' বাবুর দশ অবতার তখন বাঙালীসমাজের সর্বকর্ম পরিচালন তৎপরদের উল্লেখ করে বিশেষ সামাজিক অবস্থার ওপর ব্যঙ্গের দৃষ্টি রেখেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। তিনি বললেন—'যাঁহার ইষ্টদেবতা ইংরেজ, গুরু ব্রাহ্মধর্ম্মবেত্তা, বেদ দেশী সংবাদপত্র, এবং তীর্থ "ন্যাশানাল থিয়েটার", তিনিই বাবু।' বঙ্কিমচন্দ্রের সংজ্ঞাপ্রাপ্ত বাবুদের বিষয় বাংলা সাহিত্যে অনেক কথা অনেক ঢঙে বলা হয়েছে। কিন্তু এমন অল্প কথায় তীক্ষ্ণ ইঙ্গিতে কয়জন বলতে পেরেছেন? বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টির ও প্রকাশভঙ্গিটির বিশেষ গুণেই অনেক বড় দরের ভাবনার বিষয় অতি সহজভাবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেয়েছে। 'সংসার বন্ধনে প্রণয় প্রধান রজ্জু।'—এ কথা কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের মধ্যে পাই। 'বয়সে কি যৌবন যায়? যৌবন যায় রূপে আর মনে; যার রূপ নাই, সে বিংশতি বয়সেও বৃদ্ধা; যার রূপ আছে, সে সকল বয়সেই যুবতী। যার মনে রস নাই, সে চিরকাল প্রবীণ; যার মনে রস আছে, সে চিরকাল নবীন।' 'দুর্গেশনন্দিনী'তে একি বিপর্যয়কারী উক্তি, একেবারে স্থির যৌবনার প্রশস্তিপ্রায়! 'রজনী' কাহিনী বলতে গিয়ে আর একটি এমনি শাশ্বত সত্যবাণী উচ্চারিত হয়েছে—'রূপ রূপবানে নাই, দর্শকের মনে; নহিলে একজনকে সকলেই সমান রূপবান্ দেখে না কেন?'

বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'জীবনচরিত ও কবিত্ব' বিষয়ে লিখতে গিয়ে এক জায়গায় লিখছেন—'দেশবাৎসল্য! বাৎসল্য পরমধর্ম্ম; কিন্তু এ ধর্ম্ম অনেক

দিন হইতে বাঙ্গালা দেশে ছিল না। কখনও ছিল কি না, বলিতে পারি না। এখন ইহা সাধারণ হইতেছে দেখিয়া আনন্দ হয়, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে ইহা বড়ই বিরল ছিল। তখনকার লোকে আপন আপন সমাজ, আপন আপন জাতি, বা আপন আপন ধর্ম্মকে ভালবাসিত, ইহা দেশবাৎসল্যের ন্যায় নহে—অনেক নিকৃষ্ট। মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা দেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদিগেরও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বগামী।' স্বদেশ ভাবনায় একদিন বাঙালীর যে ক্রমিক বোধ ও বোধিজ্ঞান আসছে তা বঙ্কিমচন্দ্র বুঝতে পারছিলেন। এবং তিনি তা বোঝাতে চাইছিলেন 'আনন্দমঠ' কাহিনীর মধ্যে বা 'বন্দেমাতরম্' সংগীতে। তিনি ঈশ্বর গুপ্তের নির্ভেজাল স্বাদেশিকতাকেও অভিনন্দিত করে লিখেছেন—'তিনি বিদেশের ঠাকুরদিগের প্রতি ফিরিয়াও চাহিতেন না, দেশের কুকুর লইয়াও আদর করিতেন।' বাংলা নববর্ষের দিনে ১২৫৭ সালের পয়লা বৈশাখ থেকে প্রতি বছর গুপ্তকবি 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার দপ্তরে 'একটি নূতন অনুষ্ঠান করেন' বলে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন। বোধ হয় নববর্ষে আধুনিক বাঙালিদের সাহিত্যসভার সূত্রপাত এখানেই। বঙ্কিমচন্দ্র এটিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন—'সেই সভায় নগর, উপনগর এবং মফস্বলের প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক এবং সে সময়ের সমস্ত বিদ্বান্ ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ আমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইতেন। কলিকাতার ঠাকুরবংশ, মল্লিকবংশ, দত্তবংশ, শোভাবাজারের দেববংশ প্রভৃতি সমস্ত সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেরা সেই সভায় উপস্থিত হইতেন।' তার পর ছাত্রদের রচনার উৎকর্ষ বিচারে পুরস্কার প্রদান করা হত এবং 'সভাভঙ্গের পর ঈশ্বরচন্দ্র সেই আমন্ত্রিত প্রায় চারি পাঁচ শত লোককে মহাভোজ দিতেন।' বাঙালীর একটা একাত্ম হওয়ার দিক, একটা সাহিত্যসমাজ গড়ার দিকও বলা যায় সূচনা হয়েছে সেদিনই।

সুরসিক বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞানভাণ্ডারকে আত্মসাৎ করার জন্যেই যথার্থভাবে স্বদেশিয়ানা যে গৌরবের তা বুঝেছিলেন। এবং বুঝেছিলেন বলেই তিনি লিখতে পেরেছিলেন নকল সাহেবিয়ানার বাঙালীসন্তানদের বিষয়ে। বঙ্কিমচন্দ্র সরস ভঙ্গিতেই লিখেছেন—'প্রবাদ আছে যে, গরিব বাঙ্গালীর ছেলে সাহেব হইয়া, মোচার ঘণ্টে অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। সামগ্রীটা কি এ? বহুকষ্টে পিসীমা তাঁহাকে সামগ্রীটা বুঝাইয়া দিলে, তিনি স্থির করিলেন যে, এ

"কেলা কা ফুল।" রাগে সর্ব্বাঙ্গ জলিয়া যায় যে, এখন আমরা সকলেই মোচা ফেলিয়া কেলা কা ফুল বলিতে শিখিয়াছি।' খাঁটি বাঙালিয়ানার মধ্যে যে নিজের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতাবোধ প্রকাশিত হতে পারে তার যেন জলন্ত অথচ সহজ সরল রূপকের আশ্রয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের এই বক্তব্য উপস্থাপনা।

সাহিত্য বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র মৌলবক্তব্যে বলেন—'সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্বমাত্র।' তাঁর 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধের মধ্যেই এমন উক্তি করলেন। জগৎ, জীবন ও সমাজের সামগ্রিক দৃষ্টি নিয়েই তো সাহিত্য ও সাহিত্যিক, কবি ও কাব্য। আমাদের প্রাচীন ও আধুনিক সর্বকালের সাহিত্যভাবনার মধ্যেই তাঁর ভাব ও ভাবনা অনুপ্রবিষ্ট হয়। এখানে তিনি শাশ্বত বাণীর প্রবক্তাই।

'স্থূল কথা সাহিত্য কি জন্য? গ্রন্থ কি জন্য? যে পড়িবে, তাহার বুঝিবার জন্য। না বুঝিয়া, বহি বন্ধ করিয়া পাঠক ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাকিবে, বোধ হয়, এ উদ্দেশ্যে কেহ গ্রন্থ লিখে না।' বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের লৌকিক মানসিকতাকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করেই 'বাঙ্গালা ভাষা' নামক সুপরিচিত প্রবন্ধটিতে এমনি সিদ্ধান্তের মধ্যে পাঠককে উপনীত করেন। বললেন—'রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা এবং স্পষ্টতা।' তার পর বলছেন—'সরলতা স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য্য মিশাইতে হইবে।' এবং 'বিদ্যাসাগর বা ভূদেব-প্রদর্শিত সংস্কৃত-বহুল' বাংলা রচনারীতিতে যদি ভাবের প্রকাশ অনুকূল মনে হয় তবে তাই যেন ব্যবহার করা হয় বলেই বঙ্কিমচন্দ্র অভিমত দিয়েছেন। তিনি এ বিষয়ে অত্যন্ত উদারভাবে লেখকের স্বাধীনতা স্বীকার করেছেন। তিনি তো বলেই দিয়েছেন—'বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে, যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে—তজ্জন্য ইংরাজি, ফার্সি, আরবী, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না।'

'আর্য্যজাতির সূক্ষ্মশিল্প' বিষয়ের আলোচনাটিতে বঙ্কিমচন্দ্র বললেন—'এই সৌন্দর্য্য-তৃষ্ণা যেরূপ বলবতী,—সেইরূপ প্রশংসনীয়া এবং পরিপোষণীয়া। মনুষ্যের যত প্রকার সুখ আছে, তন্মধ্যে এই সুখ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, কেন না, প্রথমতঃ ইহা পবিত্র, নির্ম্মল, পাপসংস্পর্শশূন্য; সৌন্দর্য্যের উপভোগ কেবল মানসিক সুখ, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইহার সংস্পর্শ নাই।'—এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বললেন—'কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য এবং চিত্র—এই ছয়টি সৌন্দর্য্যজনিকা বিদ্যা। ইউরোপে এই সকল বিদ্যার যে জাতিবাচক নাম

প্রচলিত আছে, তাহার অনুবাদ করিয়া "সূক্ষ্মশিল্প" নাম দেওয়া হইয়াছে।' বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পরিশীলিত রুচির উন্নত মানসিকতায় উপলব্ধি করেন মানুষের সৌন্দর্যবোধই সমস্ত সৃষ্টির মৌল উদ্ভব। তিনি সুন্দর মুখেরই জয় যেমন জানতেন তেমনিই আবার মনের আর মুখের সমন্বয়ী যে সৌন্দর্য তাকেই তো অভ্যর্থনা করতে চেয়েছেন। তিনি 'দেশের শ্রীবৃদ্ধি' বলতে বুঝেছিলেন 'বঙ্গদেশের কৃষক' তথা আপামর জনসাধারণের মুখের হাসিটির মধ্যেই। তাই বললেন—'এই মঙ্গল-ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটা কথা জিজ্ঞাসার আছে, কাহার এত মঙ্গল? হাসিম শেখ, আর রামা কৈবর্ত্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে খালি পায়ে এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটি অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট বলদে ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে, উহাদের মঙ্গল হইয়াছে? উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, তাহার নিবারণ-জন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কর্দ্দমজল পান করিতেছে, ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাষের সময়, সন্ধ্যাবেলা গিয়া উহারা ভাঙ্গা পাথরে রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত নুন-লঙ্কা দিয়া আধপেটা খাইবে, তাহার পর ছেঁড়া মাদুরে, না হয় গোহালের ভূমে একপাশে শয়ন করিবে— উহাদের মশা লাগে না।' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশ্ন তাই—এদের কি শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে? এদের কি মঙ্গল হয়েছে? ইংরেজ বাহাদুরকে বলছেন—'তুমি বল দেখি যে, তোমা হইতে এই হাসিম শেখ, আর রামা কৈবর্ত্তের কি উপকার হইয়াছে?' বঙ্কিম-বান্ধব দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের কথাও এখানে মনে এসে যায়। বঙ্কিমচন্দ্র গভীর মমতার সঙ্গে বলছেন—'যার ধন, তার ধন নয়। যাহার মাথার কালঘাম ছুটাইয়া ফসল জন্মে, লাভের ভাগে সে কেহ হইল না।' বৃটিশ সরকারের অন্যতম বিচারক ও প্রশাসক হয়েও বঙ্কিমচন্দ্র যে বেদনা বোধ করেছেন দেশের সাধারণের জন্যে তা বলতে কোনো রকম দ্বিধা করেন নি। অসংকোচে বললেন—'এমন শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে জয়ধ্বনি তুলিতে চাহে তুলুক; আমি তুলিব না। এই নয় শত নিরানব্বই জনের শ্রীবৃদ্ধি না দেখিলে আমি কাহারও জয়গান করিব না।'

বাহ্যিক আড়ম্বরা করে নয় আন্তর সম্পদের গৌরবে গর্বিত হতে কি পারছে দেশ ও জাতি? তাই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য প্রচেষ্টা সামগ্রিক উন্নতির উপস্থাপনায় এবং চিত্তের সর্বোদয়ের অভিমুখী হয়ে। 'কৃষ্ণচরিত্রে' তাই বললেন —'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যেই মনুষ্যের চরিত্রের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। একটা

মহৎ কার্য্য বহুরোয়েনও চেষ্টা-চরিত্র করিয়া করিতে পারে, এবং করিয়াও থাকে। কিন্তু যাঁহার ছোট কাজগুলিও ধর্ম্মাত্মকতার পরিচায়ক, তিনি যথার্থ ধর্ম্মাত্মা।'

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের যে বিশিষ্ট অবদান তা তাঁর ভাষা ও ভাবের বিচিত্রধারায় রসসৃষ্টি। অনেক প্রাজ্ঞ সমালোচক তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে রোমান্সরসের প্রাধান্য দেখেছেন এবং বলেছেন যে তাঁর রোমান্স সৃষ্টির দিকেই ঝোঁকটা ছিল বেশি। তা হলেও তার মধ্যে যে সাহিত্যরস ও জীবনবোধ রয়েছে সেটাই মহৎ সাহিত্যরূপে শাশ্বত।

বাংলা সাহিত্যে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের আসন উচ্চতম সম্মানের স্থানে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর রচনার যে বিচিত্রমুখী প্রবাহ তার মধ্যে অবগাহন করেছেন পরবর্তী সাহিত্যপাঠকের বিভিন্ন রুচির মন ও মনন, এবং সকলেই আপন আত্মপ্রসাদের সম্পদ আহরণ করেছেন এবং নিজেদের সাহিত্যভাবনার কেন্দ্রভূমিকে উর্বর মৃত্তিকান্তরে উন্নীতই করেছেন।

বৃটিশ ভারতে বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্' ধ্বনি জাতীয় প্রেরণার উৎসস্থল ছিল। আজ স্বাধীনতার পরবর্তী জীবনধারাতেও সেই বাণী স্বদেশ ভাবনার উদ্বোধক। তাঁর ব্যঙ্গকৌতুক রচনা, তাঁর উপন্যাস, তাঁর জাতি গঠনের চিন্তা-ভাবনার রচনাবলী সব যুগের সব কালের এবং সব দেশের। আজ বহুল প্রচার ও প্রসার, স্থায়ী স্মৃতি ও শাশ্বত মর্যাদায় দেশবিদেশে পরিব্যাপ্ত করার ব্রত গ্রহণ করার প্রয়োজন, তাঁর ভাবাদর্শ জীবনের মৌলভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়োজন। বর্তমান বিক্ষোভের এই সমাজ একটি সুস্থ আবহাওয়ায় তবেই বুঝি অবগাহন করতে পারবে। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতির দীপাবলী জ্বালানোর প্রয়োজন জাতির প্রয়োজনে, জাতীয় জীবনের প্রয়োজনে, বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতের প্রয়োজনে।

সাহিত্যদর্পণে শরৎচন্দ্র

প্রত্যিটি মানুষের একটি বিশিষ্ট জীবনদর্শন থাকে যা তাঁর উপলব্ধির জগৎকে নিজস্ব রূপে চিহ্নিত করে।

একজন সাহিত্যিক সেই নিজস্ব বোধির আলোকে অনুভূত জীবন ও জগৎকে সত্যরূপে জ্যোতির্ময় মূর্তি পরিগ্রহ করান যেখানে ব্যক্তি ও সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতির শেষপ্রান্তও পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়ে ওঠে। যথার্থ সৎপাঠক অতর্কিত প্রজ্ঞানে সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ কোন পথে তার নির্দেশ নিয়ে আপন চেতনায় লাভ করেন জাগৃতি। তাই দেখা যায় সাধারণের সামাজিক কর্তব্যকেও সাহিত্যিকের জীবনদৃষ্টি প্রভাবিত করে অজান্তে এবং অযাচিতভাবে।

রামমোহন বা বিদ্যাসাগর আমাদের বাঙালীর তথা ভারতীয়ের জীবনে নব-জাগরণের যে বীজমন্ত্র দিয়েছেন, যে সংস্কারকের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়েছেন তা সর্বজন স্বীকৃত। বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের মার্গে শুভবুদ্ধির উদ্বোধন সাধনে যে জ্বলন্ত দীপ্তির অনির্বাণ জ্যোতি, শরৎচন্দ্র তো তারই বহ্নিশিখার নবীন আলোক। যা ঘরে ঘরে অন্ধকারের উৎস থেকেই যেন শাশ্বত সত্যের সিদ্ধিতে যথার্থই ঔজ্জ্বল্যে উৎসারিত হয়ে একটি কল্যাণদীপ পাঠকহৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত করে।

অভিজ্ঞতার বিচিত্রমুখী অনুভবে এবং জীবননাট্যের এক বর্ণাঢ্য বিভূতিতে শরৎচন্দ্র এমনি একটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রচনা করেছিলেন যা যে কোনো সাহিত্যিকের অমূল্য সম্পদ। সমাজের অতিশয় নিম্নস্তরের এবং অবহেলিত জীবন থেকে আরম্ভ করে অতি উচ্চের এবং অবিমৃষ্যকারী জীবন পর্যন্ত ছিল তাঁর একান্তই প্রত্যক্ষভাবে ও ঘনিষ্ঠভাবে দেখা জানা ও চেনা।

সাহিত্যিক যে রসদৃষ্টির বলে দেখাকে আরো স্পষ্ট করে সৌন্দর্যশ্রীর ভূষণে অলঙ্কৃত করেন তা যোগ্য শিল্পীরই পরিচায়ক। সেই শিল্পীর বর্ণালী কৃপায় জগৎ ও জীবন সাহিত্যের আঙিনায় অনুপ্রবেশ ক'রে তা চিরন্তন সাহিত্যেরই সামগ্রী হয়ে ওঠে। শরৎচন্দ্র তাঁর পরিচিত পরিবেশের এবং প্রত্যক্ষীভূত চরিত্রের দোষগুণ, পূর্ণতা-অপূর্ণতা ও সমাজের অনুশাসনে অতিষ্ঠ ব্যর্থজীবনের কাহিনী বিবৃত করে গিয়েছেন। এবং দেখিয়েছেন খল চতুর ভণ্ড ক্ষুদ্র-স্বার্থসিদ্ধির জন্ত

বু চক্রীর ও জঘন্ত মনোপ্রবৃত্তির যত সব ঘৃণ্য মানুষের সমাজপতির আসন দখল করার ফলে, কি নিদারুণ পরিণতি!

যাঁরা দল ভারী করেন, যাঁরা বয়সে জ্যেষ্ঠের দাবি নিয়ে নিজেদের চরম কুসংস্কারের মোহে অন্তমানসিকতাকে নিম্নতম পর্যায়েও প্রয়োগ করতে যান পল্লীর সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে, তাঁরা অত্যন্ত বলিষ্ঠ রেখায় অঙ্কিত হয়েছেন শরৎচন্দ্রের তুলিতে। এইভাবে শরৎসাহিত্যের বিভিন্ন কাহিনীতে পুরুষ এবং মহিলা—উভয় চরিত্রই বেশ ঔজ্জ্বল্যলাভ করেছেন। ছোটো ছেলে ছোটো মেয়ের চরিত্র, নতুন বৌ বা বিধবা কন্তার সংসারে বিশেষ ভূমিকাটি এবং তাদের যথার্থ মর্যাদা কোথায় ক্ষুণ্ণ হচ্ছে তাও তো শরৎচন্দ্রের লেখনীতে জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই সবের মধ্যেই একটা সার্বজনীন আবেদন থাকায় পাঠকের মনে এদের প্রতি দরদ আপনা আপনিই আকর্ষিত হয়েছে।

এই ভাবে আপনা থেকেই সহৃদয় পাঠকের মনে যে গভীর দরদ ও সহজ সহানুভূতি আকর্ষণ করা যায় তাতেই কথাসাহিত্যিক হিসেবে শরৎচন্দ্র সেই দুর্লভ প্রতিভার তুঙ্গশীর্ষে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং তাই তাঁর জনপ্রিয়তা জীবৎকালেই অপরিসীম ছিল। একটা যাদুবলে পাঠকের হৃদয়-সিংহাসনে তিনি আসন পেতেছিলেন। মনমাতানোর কাহিনীব্যঞ্জনায় ছিল তাঁর যেন সোনার কাঠির ছোঁয়া।

রবীন্দ্রনাথ 'বাস্তব' প্রবন্ধের একজায়গায় লিখছেন—'লোক যদি সাহিত্য হইতে শিক্ষা পাইতে চেষ্টা করে তবে পাইতেও পারে কিন্তু সাহিত্য লোককে শিক্ষা দিবার জন্ত কোনো চিন্তাই করে না।' শরৎচন্দ্র যে সাহিত্যরচনা করলেন সেখানে সমাজের বাস্তব চিত্রটি উদ্ঘাটিত হল পাঠকের হৃদয়রাজ্যে এবং সৃষ্টি করল একটি অনুভূতির অনুরণন।

এই অনুরণন থেকেই যতটা শিক্ষার। বোধ হয় এ ভাবেই বেশি করে এবং সহজেই মনের কাছাকাছি আবেদন পৌছায়। যথার্থ দরদী মেজাজটি লেখকের ছিল অকৃত্রিম। তাই পাঠককে উপনীত করেছেন তিনি তা সহজ উপলব্ধিতে সার্থকতা লাভ করতে।

'সাহিত্যে যখন কোনো জ্যোতিষ্ক দেখা দেন তখন তিনি নিজের রচনায় একটি বিশেষ রূপ নিয়ে আসেন। তিনি যে ভাবকে অবলম্বন করে লেখেন তারও বিশেষত্ব থাকতে পারে, কিন্তু সেও গৌণ; সেই ভাবটি যে বিশেষরূপ অবলম্বন করে প্রকাশ পায় সেটিতেই তার কৌলিন্য। বিষয়ে কোনো অপূর্বতা

না থাকতে পারে, সাহিত্যে হাজার বার বার পুনরাবৃত্তি হয়েছে এমন বিষয় হলেও কোনো দোষ নেই, কিন্তু সেই বিষয়টি যে-একটি বিশেষ রূপ গ্রহণ করে তাতেই তার অপূর্বতা।' রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যরূপ' প্রবন্ধে এই শাশ্বত সত্যবাণী উচ্চারণ করেছেন। শরৎচন্দ্র জীবনের ও সমাজের চিরন্তন বেদনার কথা ও বঞ্চনার কথাই বলেছেন কিন্তু বলেছেন এমন একটা বিশিষ্ট রসের পরিবেশ রচনা করে যাতে অতি সহজেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও আকর্ষণীয় অনুভূতি পাঠকহৃদয়ে সঞ্চারিত হয়।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যবোধ ও রসানুভূতির গভীরতা এক বিশেষ বোধির আলোকে স্থিতধী ছিল। প্রথম দিকের রচনা বাদ দিলে তাঁর রচনার মধ্যে এমন একটা মনছোঁয়া ভাবনার প্রকাশ ঘটে যা পাঠকহৃদয়কে সহজেই আকৃষ্ট করে। সাহিত্য রচনায় তাই বলা যায় এক বিশেষ যাদুমন্ত্র যেন তিনি আয়ত্ত করেছিলেন, যা সহজেই পাঠকহৃদয়কে আন্দোলিত করে তোলে। সাহিত্যিকের মৌলচিন্তাই হল পাঠকহৃদয়ে রসসঞ্চার করা।

বিভিন্নজনকে লেখা চিঠিপত্রেও শরৎচন্দ্র অনেক মূল্যবান সাহিত্যভাবনার কথা ব্যক্ত করেছেন। যেমন উল্লেখ করা যায় একটি উক্তি—'আতিশয্যের ট্রাজেডি আমাদের সাহিত্যে সগৌরবে বিরাজমান।' এমনি কতই-না আপন মনের যথার্থ এবং নির্ভেজাল ভাবনা বিধৃত হয়ে রয়েছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী সংকলন করেন প্রথমে তার পর আরো এ ধরনের কাজ করা হয়েছে। এমনি এক পত্রে শরৎচন্দ্র লিখছেন—'সাহিত্য-রসের মধ্য দিয়ে পাঠকের চিত্তে যেমন সুবিমল আনন্দের সৃষ্টি করে, তেমনি পারে করতে মানুষের বহু অন্তর্নিহিত কুসংস্কারের মূলে আঘাত। এর ফলে মানুষ হয় বড়, তার দৃষ্টি হয় উদার, তার সহিষ্ণু ক্ষমাশীল মন সাহিত্যরসের নূতন সম্পদে ঐশ্বর্যবান হয়ে ওঠে।' এবং উপন্যাস রচনায় সাহিত্যসৃষ্টির প্রাথমিক রীতি প্রসঙ্গে পত্রাবলীতে নির্দেশ দিয়েছেন এমনও একটি উদাহরণের উদ্ধৃতি দেওয়া যায়। তিনি লিখছেন—'গ্রন্থকারের মুখে রচনার বিষয়টা চৌদ্দ আনা না দিয়ে পাত্রপাত্রীর মুখে দিতে হয়। শুধু যেখানে তা পারা যায় না সেইখানেই কেবল গ্রন্থকারের মুখের কথায় পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি হয় না।' এই পত্রেই আরো দামী কথা বললেন—'কতটা গ্রন্থকার বলিবে এবং কতটা পাঠকেরা সম্পূর্ণ করিয়া লইবে এই জিনিসটা শিক্ষা সাপেক্ষ। এবং বুদ্ধি সাপেক্ষও বটে।'

শরৎচন্দ্র 'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি' প্রবন্ধটি লেখেন 'বিচিত্রা'য় ১৩৩৪

শ্রাবণে রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম' ও ভাদ্রে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'সাহিত্যধর্মের সীমানা' প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর। এই আলোচনায় শরৎচন্দ্র লিখছেন—'সংসারে রাবিশ বই-ই কেবল একমাত্র রাবিশ নয়, সমালোচনার ছলে দায়িত্ব বিহীন কটূক্তির রাবিশেও বাণীর মন্দিরপথ একেবারে সমাচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারে। নবীন সাহিত্যিকদের রচনায় যে বঙ্গসাহিত্য নিম্নমুখী নয় এমনি একটা ধারণা শরৎচন্দ্র পোষণ করেছেন এবং সমালোচকদের বাড়াবাড়িটাকে অসহ্য মনে করেছেন তাই লিখলেন— মন্দ বই ভালো নয় কিন্তু তাকে ঠেকাবার জন্যে সাহিত্যসৃষ্টির দ্বার রুদ্ধ করে ফেলা সহস্র গুণ অধিক অকল্যাণকর।' তিনি তাই লিখলেন—'সাহিত্যিকদের কেবল কটু কথার চাবুক মেরে মেরেই তাঁদের দিয়ে পছন্দমতো ভালো ভালো বই লিখিয়ে নেওয়া যাবে না।'

রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার মিলন' নামে একটি প্রবন্ধ লিখলেন ১৩২৮ সালের আশ্বিন সংখ্যার 'প্রবাসী' তে। ঠিক মতের মিল যেন হল না শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কবির বক্তব্যে। তিনি 'শিক্ষার বিরোধ' নামে প্রবন্ধ পাঠ করলেন ঐ সালেই 'গৌড়ীয় সর্ববিদ্যা আয়তনে'। এই প্রবন্ধে খোলাখুলিভাবে তাঁর অভিমত প্রকাশ করে লিখলেন—'পশ্চিমের বিদ্যার অনেকগুণ থাকতে পারে, কিন্তু সে যদি আমাদের নিজেদের প্রতি কেবল অনাস্থাই এনে দিয়ে থাকে—আমাদের জ্ঞান, আমাদের ধর্ম, আমাদের সমাজসংস্থান, আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি সকলের প্রতি যদি শুধু অশ্রদ্ধাই জন্মিয়ে দিয়ে থাকে—ত মনে হয়, লুব্ধচিত্তে পশ্চিমের শুক্রাচার্যের পানে আমাদের না তাকানোই ভালো।'

স্বদেশী ভাবনায় ভাবিত মানসিকতা নিয়ে শরৎচন্দ্রের চিন্তাধারা প্রবাহিত ছিল। যদিও তাঁর প্রথমদিকের প্রকাশিত গল্প 'কোরেল' পাঠ করলে বোঝা যায় ইংরেজি 'নভেল' পাঠক তরুণমনের অনুকরণসর্বস্ব সে রচনা। সে কথা থাক। শরৎচন্দ্র শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বদেশীয় বাতাবরণ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। তাঁর যুক্তি হচ্ছে—'শিক্ষার বিরোধ আসলে এইখানে। সে শুধু দেহের গঠনে নয়, সে অন্তরের আত্মায়।' আমাদের দেশের অন্তরগভীরে যে রস আছে তাই দিয়েই আত্মস্থ হবার প্রয়োজনীয়তা প্রথমে এবং সর্বাগ্রে। শ্রদ্ধার ভাব আনা প্রয়োজন স্বদেশীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি—নইলে বিদেশীভাবে আপন অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়। তাই শরৎচন্দ্র বললেন—'দুঃখ কিছুতেই ঘুচবে না, যতক্ষণ না সেই শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়, যাতে দেশের বহির্মুখী বীতশ্রদ্ধ মন আর একবার অন্তর্মুখী ও আত্মস্থ হয়। মনের মিলনই বা কি, আর শিক্ষার মিলনই বা

কি, সে কেবল হতে পারে সমানে সমানে শ্রদ্ধার আদান প্রদান। এমন কাঙালের মতো, ভিক্ষুর মতো কিছুতেই হবে না। হলেও সে শুধু একটা গোঁজামিল হবে—তাতে কল্যাণ নেই, গৌরব নেই, দেশকে সে কেবল হীনতা লাঞ্ছনাই দেবে, কোনোদিন মনুষ্যত্ব দেবে না।' শরৎচন্দ্র তাই আরো স্পষ্ট ভাষায় এর পরই বললেন—'কোনো বড় জিনিসই কখনো নিজের অতীতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে নিজের শক্তির প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে হয় না—হবার যোই নেই।'

শরৎচন্দ্র আধুনিক সাহিত্যের বিচারে কিন্তু বললেন অন্য কথা। সেখানে নবীনের জয়যাত্রা এবং তরুণের বিদ্রোহকে যেন আহ্বান জানাচ্ছেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ বঙ্কিম-শরৎ সমিতির প্রদত্ত জন্মদিনের অভিনন্দনের উত্তরে পঠিত 'অভিভাষণে' বললেন—'মনে হয় আধুনিক-সাহিত্য-বিচারেও এই সত্যটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, সাহিত্যরচনায় আর যাই কেন না হোক, শ্লীলতা, শোভনতা, ভদ্ররুচি ও মার্জিত মনের রসোপলব্ধিকে অকারণ দাম্ভিকতায় বারম্বার আঘাত করতে থাকলে বাংলা-সাহিত্যের যত ক্ষতিই হোক, তাঁদের নিজেদের ক্ষতি হবে তার চেয়েও অনেক বেশি। সে আত্মহত্যারই নামান্তর।' সাহিত্যের যথার্থবিচার তিনি কোনো মতবাদে বা পূর্বসূরীর নির্দেশিতধারা-সর্বস্ব হয়ে উচ্চকণ্ঠ হওয়াকে যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি।

শরৎচন্দ্র তাঁর অমর গল্প-উপন্যাসের নানাস্থানেই শাশ্বত সত্যের অপূর্বকথা উচ্চারণ করেছেন। এমনি একজায়গায় বলছেন—'মানুষের অন্তর জিনিসটিকে চিনিয়া লইয়া, তাহার বিচারের ভার অন্তর্যামীর উপর না দিয়া মানুষ যখন নিজেই গ্রহণ করিয়া বলে, আমি এমন, আমি তেমন এ কাজ আমার দ্বারা কদাচ ঘটিত না, সে কাজ আমি মরিয়া গেলেও করিতাম না—আমি শুনিয়া আর লজ্জায় বাঁচি না। আমার শুধু নিজের মনটাই নয়; পরের সম্বন্ধেও দেখি, তাহার অহঙ্কারের অন্ত নাই। একবার সমালোচকের লেখাগুলো পড়িয়া দেখ —হাসিয়া আর বাঁচিবে না। কবিকে ছাপাইয়া তাহার কাব্যের মানুষটাকে চিনিয়া লয়। জোর করিয়া বলে, এ চরিত্র কোনো মতেই ওরূপ হইতে পারে না, সে চরিত্র কখনও সেরূপ করিতে পারে না—এমনি কত কথা। লোকে বাহবা দিয়া বলে, বাঃ রে, বাঃ! এই তো ক্রিটিসিজম্‌! একেই ত বলে চরিত্র-সমালোচনা! সত্যই ত? অমুক সমালোচক বর্তমান থাকিতে ছাই-পাঁশ যা-তা লিখিলেই কি চলিবে? এই দেখো বইখানার যত ভুল ভ্রান্তি সমস্ত

তন্ন তন্ন করিয়া দিয়াছে? তা দিক। ত্রুটি আর কিসে না থাকে! কিন্তু তবুও যে আমি নিজের জীবন আলোচনা করিয়া, এই সব পড়িয়া তাদের লজ্জায় আপনার মাথাটা তুলিতে পারি না। মনে মনে বলি, হা রে পোড়া কপাল! মানুষের অন্তর জিনিসটা যে অনন্ত, সে কি শুধু একটা মুখেরই কথা! দম্ভ প্রকাশের বেলায় কি তাহার কানাকড়ির মূল্য নাই? তোমার কোটী-কোটী জন্মের কত অসংখ্য কোটী অদ্ভুত ব্যাপার যে এই অনন্তে মগ্ন থাকিতে পারে, এবং হঠাৎ জাগরিত হইয়া তোমার ভূয়োদর্শন, তোমার লেখাপড়া, তোমার মানুষ বাছাই করিবার জ্ঞানভাণ্ডটুকু এক মুহূর্তে গুড়া করিয়া দিতে পারে, এ কথাটা কি একটিবারও মনে পড়ে না! এও কি মনে পড়ে না, এটা সীমাহীন আত্মার আসন?'

এই অপূর্ব সত্যভাষণটি শরৎচন্দ্র তাঁর 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্ব নয়ের অধ্যায়ের সূচনায় ব্যক্ত করেছেন। তিনি এর পরই যে যথার্থ উক্তি তুটি করেছেন তাও স্মরণীয়। তিনি বলছেন—'পরশমানিকস্পর্শে আমার অন্তর-বাহিরের সব লোহা সোনা হইয়া গিয়াছে, কোথাকার কোন জল-হাওয়ার দৌরাত্ম্যেই আর মরিচা লাগিয়া ক্ষয় পাইবার ভয় নাই।' কোনো মেকির জৌলুসে ভুলবার মনীষী শরৎচন্দ্র নন। কারণ তিনি নিজেই বলেছেন—'আমার বুকের কষ্টিপাথরে পাকা সোনার কষ ধরানো আছে, সেখানে পিতলের দোকান খুলিলে খরিদ্দার জুটিবে না।'

তাঁর উপন্যাসেও গল্প বলার স্থানে স্থানেএমনি সব শাশ্বত সত্যবাণীকেই উচ্চারণ করেছেন যা চিরন্তন মননশীল মনীষীর উক্তিকেও ছাপিয়ে যায়। শরৎচন্দ্র জীবন-অভিজ্ঞতাকে এবং আপন উপলব্ধ-অনুভূতিকে এমনি ধ্রুবধ্যানে গ্রহণ করেছেন যে তার এতটুকু বিচ্যুতিও অসহ্য মনে করতেন। নিজের বোধ ও বোধিকে, নিজের প্রজ্ঞার আলোকে উদ্ভাসিত করেছিলেন শরৎচন্দ্র। তিনি নিজের সেই দরদী হৃদয়ের স্বর্ণপ্রভাকে প্রতিমুহূর্তে প্রজ্জ্বলিত রাখতেন। সেসব ছিদ্রান্বেষী সমালোচনাকে. তিনি ব্যঙ্গ করে তাই নিজে শুধু মনের নেহাত তাগিদেই যেন কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধ-নিবন্ধের বই বলতে তিনটির উল্লেখ করা চলে—১৯২৩ এপ্রিলে প্রকাশিত 'নারীর মূল্য', ১৯২৯ এপ্রিলে 'তরুণের বিদ্রোহ' এবং ১৯৩২ আগস্টে 'স্বদেশ ও সাহিত্য'।

শরৎচন্দ্রের জীবনধর্মে যে বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য, যে দীক্ষা ও দরদ—তা যে কোনো প্রথম শ্রেণীর লেখকেরই বিপুল অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্য। আত্মকথা বিবৃত

করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র 'বাতায়ন' ১৩৪৪ সালের শরৎস্মৃতি সংখ্যায় বলেছেন - 'পিতার নিকট হতে অস্থির স্বভাব ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকার সূত্রে আর কিছুই পাই নি। পিতৃদত্ত প্রথম গুণটি আমাকে ঘর-ছাড়া করেছিল—আমি অল্প বয়সেই সারা ভারত ঘুরে এলাম। আর পিতার দ্বিতীয় গুণের ফলে জীবন ভরে আমি কেবল স্বপ্ন দেখেই গেলাম।' সাহিত্য-সৃষ্টির মৌলপ্রেরণার স্বরূপে শরৎচন্দ্র পিতৃদেবের অসমাপ্ত গল্প-উপন্যাসগুলির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপের ইংগিত নিজের রচনাতেই দিয়ে গিয়েছেন। পিতা শরৎ-জীবনে সাহিত্যসৃষ্টির উৎসমুখ ছিলেন এবং পিতার অসমাপ্ত সাহিত্যের স্রষ্টা হয়ে যে মনোক্ষোভ ছিল তাঁর তা নিজের জীবনে স্রষ্টা হয়ে সফল করলেন তিনি অপরাজেয় কথাশিল্পী রূপে।

'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বের গোড়ার দিকেই লিখলেন—'যাহার পা দুটা আছে, সেই ভ্রমণ করিতে পারে; কিন্তু হাত দুটা থাকিলেই ত আর লেখা যায় না। সে যে ভারি শক্ত। তা ছাড়া মস্ত মুস্কিল হইয়াছে আমার এই যে, ভগবান আমার মধ্যে কল্পনা-কবিত্বের বাষ্পটুকুও দেন নাই। এই দুটো পোড়া চোখ দিয়া আমি যা কিছু দেখি ঠিক তাহাই দেখি!' শরৎচন্দ্র নিজের ভাবকল্পনার রঙমেশানোর ফলে অতিশয়োক্তির আশ্রয়ে কোনো উদ্ভট উপমার প্রতিমাগঠনে উৎসাহী ছিলেন না। তাই বলছেন—'গাছকে ঠিক গাছই দেখি—পাহার-পর্বতকে পাহাড়-পর্বতই দেখি। জলের দিকে চাহিয়া জলকে জল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না? আকাশে মেঘের পানে চোখ তুলিয়া রাখিয়া, ঘাড়ে ব্যথা করিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু যে মেঘ সেই মেঘ! কাহারো নিবিড়-এলোকেশের রাশি চুলোয় যাক্— একগাছি চুলের সন্ধানও কোনোদিন তাহার মধ্যে খুঁজিয়া পাই নাই। চাঁদের পানে চাহিয়া চাহিয়া চোখ ঠিক্‌রাইয়া গিয়াছে, কিন্তু কাহারো মুখ-টুখ ত কখনো নজরে পরে নাই।' নিজের কল্পনার দৈন্য বোঝাতে গিয়ে এমনি কল্পনার আশ্রয় নিয়ে বর্ণনা করেছেন যা তাঁর নিজের উক্তিকেই অগ্রাহ্য করছে। তাই তিনি যতই বলুন যে, 'এমন করিয়া ভগবান যাহাকে বিড়ম্বিত করিয়াছেন, তাহার দ্বারা কবিত্ব সৃষ্টি করা ত চলে না।' এ কথা মানতে পারা যায় না। তবে এরপর তিনি যে উক্তিটি করেছেন সেটাই সাহিত্যের ও সাহিত্যিকের মৌলদর্শন। তিনি এই রচনার মধ্যেই সর্বকালের ও সর্বদেশের সার্থক সাহিত্যস্রষ্টার মৌল অনুসরণযোগ্য আদর্শরূপে যথার্থ ই

বলছেন—'চলে শুধু সত্য কথা সোজা করিয়া বলা।' অর্থাৎ গভীর উপলব্ধি ও অনুভূতিকে যথার্থই সাহিত্যরসে পরিবেশনা।

শরৎচন্দ্র সাহিত্যসেবাকে পরিপূর্ণরূপে শেষ বা মধ্য জীবনেই ব্রতরূপে গ্রহণ করেন। আবাল্য বাসনার সার্থক সৃজনে পরিণত মানসেই সাহিত্যের বিশিষ্ট অবদান সৃষ্টি করেছেন। 'বাতায়ন'য়ের ১৩৪৩ সালের ১৫ই শ্রাবণ প্রকাশিত হয় 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' নামে একটি অভিভাষণ যা শরৎচন্দ্র সভাপতিরূপে এলবার্ট হলে সাম্প্রদায়িক নির্ধারণের প্রতিবাদকল্পে অনুষ্ঠিত সভায় প্রদান করেন। তারই শেষের দিকে বলছেন—'নিজের শক্তিমত আমি আজন্মকাল সাহিত্য-সেবা করে এসেছি,—যদি দেশের সাহিত্য বড় হয় এই আশায়;—এবং এই আশাতেই সাহিত্যের কাজে, দেশের কাজে, নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ করেছি।' এরপরই শরৎচন্দ্র আতঙ্কিতভাবে বলেছেন তাৎক্ষণিক সমস্যায় উদ্বীগমনা হয়ে 'বাংলা-সাহিত্যকে বিকৃত করবার একটি হীন প্রচেষ্টা চলছে। কেউ বলছেন, সংখ্যার অনুপাতে ভাষার মধ্যে এতগুলি 'আরবী' কথা ব্যবহার কর; কেউ বলছেন, এতগুলি 'পারসী' কথা ব্যবহার কর; আবার কেউ বা বলছেন, এতগুলি 'উর্দু' কথা ব্যবহার কর। এটা একেবারে অকারণ, —যেমন ছোট ছেলে হাতে ছুরি পেলে বাড়ীর সমস্ত জিনিস কেটে বেড়ায়, এও সেইরূপ।' দরদী কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র বেদনার সঙ্গে উপলব্ধি করছেন বাংলা ভাষার বিশুদ্ধ গতিকে অবরুদ্ধ করার হীন অপচেষ্টা দেখে। সাম্প্রদায়িকতার বিষ যে কত মারাত্মক হতে পারে তাও তাঁর সুন্দর-বোধকে পীড়িত করেছিল। তাই তিনি বলেছিলেন—'কিন্তু এখন অবস্থা এমন হতে চলেছে যে, আমার ভয় হয় হয়ত দশ বৎসরের মধ্যে সাহিত্যের আর এক যুগ এসে পড়বে; হয়ত রবীন্দ্রনাথ সেদিন থাকবেন না আমিও হয়ত ততদিন আর থাকব না। তাই এখন হতে সেই অবস্থার কথা ভেবে আমি শঙ্কিত হয়ে পড়েছি।' রবীন্দ্রনাথ 'মক্তব-মাদ্রাসার বাংলাভাষা' নামে একটি আলোচনা ১৩৩৯ ভাদ্রের 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করেন। কবি তাতে লিখলেন—'ভাষা মাত্রের মধ্যে একটা প্রাণধর্ম আছে। তার সেই প্রাণের নিয়ম রক্ষা করে তবেই লেখকেরা তাকে নূতন নূতন পথে চালিত করতে পারে। এ কথা মনে করলে চলবে না যে, যেমন করে হোক জোড়াতাড়া দিয়ে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বদল করা চলে।' এবং ১৩৪১ বৈশাখ সংখ্যায় লেখেন—'বাংলা ভাষায় সহজেই হাজার হাজার পারসী আরবী শব্দ চলে গেছে। তার মধ্যে আড়াআড়ি বা

কৃত্রিম ভেদের কোনো লক্ষণ নেই।' সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি যে কতখানি অবস্তু তা শরৎচন্দ্র মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেই ১৩৪১ সালের শারদীয় 'নাগরিক'এর পৃষ্ঠায় 'বর্তমান রাজনৈতিক প্রসঙ্গ' প্রবন্ধের মধ্যেও লিখেছেন—'কংগ্রেস দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেস চিরকাল লড়াই করে এসেছে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে। আজ তাকে ছোট প্রমাণ করবার চেষ্টায় ব্যক্তিগত গৌরব কারও কিছুমাত্র বেড়েছে কি না জানিনে, কিন্তু দেশের গৌরব বুঝি এতটুকুও বাড়ে নি।' এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন ১৩৪২ পৌষের 'প্রবাসী'তে—'আজকাল সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে আশ্রয় করে ভাষা ও সাহিত্যকে বিকৃত করবার যে চেষ্টা চলছে তার মতো বর্বরতা হতে পারে না।'

১৩২২ সালের পৌষ মাসে শিবপুর ইন্‌স্টিটিউটে 'স্বরাজ সাধনায় নারী' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। তারই একস্থানে শরৎচন্দ্র বলছেন—'দেশের নব্বই জন যেখানে বাস করে আছেন সেই পল্লীগ্রামেই আমার ঘর। মনের অনেক আগ্রহ অনেক কৌতূহল দমন করতে না পেরে অনেক দিনই ছুটে গিয়ে তাদের মধ্যে পড়েছি এবং তাদের বহু দুঃখ, বহু দৈন্যের আজও আমি সাক্ষী হয়ে আছি। তাদের সেই সব অসহ্য, অব্যক্ত, দুঃখ ও দৈন্য ঘোচাবার ভার নিতে আজ আমার দেশের সমস্ত নরনারীকে আহ্বান করতে সাধ যায়, কিন্তু কণ্ঠ আমার রুদ্ধ হয়ে আসে, যখনই মনে হয়, মাতৃভূমির এই মহাযজ্ঞে নারীকে আহ্বান করার আমার কতটুকু অধিকার আছে!'

এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের 'নারীর মূল্য' নামের প্রবন্ধগুলোর কথা স্মরণীয়। তাঁরই বোন অনিলা দেবীর নামে 'যমুনা' মাসিকপত্রে প্রবন্ধগুলো প্রথম আত্মপ্রকাশ করে এবং পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। সুন্দর যুক্তি দিয়ে দেশবিদেশের মনীষীদের উদাহরণ-উদ্ধৃতি দিয়ে শরৎচন্দ্র নারীর মর্যাদা যথার্থভাবে কোথায় তা দেখিয়েছেন। তাঁর রচনায় যে নারীর বলিষ্ঠ মূর্তি আমরা দেখি তার সহজ মানসিকতা এই আলোচনায় আরো স্পষ্ট ভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে। শরৎচন্দ্র লিখছেন—'ইংরাজিতে যাহাকে Ethics বলে, তাহার একটা গোড়ার কথা এই যে, বিসদৃশ হেতু না থাকিলে আমার স্বাধীনতাটা কেবল ততদূর পর্যন্ত টানিয়া লইয়া যাইতে পারি যতক্ষণ না তাহা আর একজনের তুল্য স্বাধীনতার আঘাত করে।' এই নিরীখে প্রত্যেক শিল্পীই জীবনচর্যাকে অনুসরণ করতে পারেন। তাই নারীর স্বাধীনতা রামমোহন চেয়েছিলেন, বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, শরৎচন্দ্রও আরো গভীর

ভাবে এই নীতিটিকে প্রয়োজনীয় বলে উপলব্ধি করেন। তিনি লিখলেন—'সুসভ্য মানবের সুস্থ সংযত শুভ বুদ্ধি যে অধিকার রমণী-জাতিকে সমর্পণ করিতে বলে, তাহাই মানবের সামাজিক নীতি এবং তাহাতেই সমাজের কল্যাণ হয়। কোনো একটা জাতির ধর্ম-পুস্তকে কি আছে না আছে, তাহাতে হয় না। নারীর মূল্য বলিতে আমি এই নীতি ও অধিকারের কথাই এতদূর পর্যন্ত বলিয়া আসিয়াছি।'

শরৎচন্দ্র যে দরদী কথাশিল্পী ছিলেন তা তাঁর গল্প-উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণেই সুপরিস্ফুটিত হয়েছে। বিশেষ করে নারী-হৃদয়ের জ্বালা যে কি তা তিনি নিখুঁতভাবে অঙ্কিত করেছেন। সমাজ সংস্কারকের দায়িত্বের কথাও তাই এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র বলতে গিয়ে 'স্বরাজ সাধনায় নারী' প্রবন্ধে বললেন—'পৃথিবীতে কোনো সংস্কারই কখনও দল বেঁধে হয় না। একাকীই দাঁড়াতে হয়। এর দুঃখ আছে। কিন্তু এই স্বেচ্ছাকৃত একাকীত্বের দুঃখ, একদিন সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বহুর কল্যাণকর হয়।'

শরৎচন্দ্রের অনেক উপন্যাসেই পল্লীবাংলার সমস্যা যে পাঠকের অন্তরে প্রত্যক্ষ ভাবমূর্তি রচনা করেছিল এবং করছে, তা সর্বজন স্বীকৃত। তাঁর স্বদেশ ভাবনা, দেশের কাজ, স্বাধীনতার সংগ্রাম বা সন্ত্রাসবাদ অনেক কিছুই উপন্যাসের উপজীব্য হয়েছে। 'মহেশ' গল্পের মধ্যে যে বেদনার চিত্র বা 'পথের দাবী'র বিশেষ সময়ের আবেদন স্বদেশী আন্দোলন কালের পথনির্দেশমূলক। উপরের উল্লেখ করা প্রবন্ধেই তিনি তাই বলেছিলেন—'দেশসেবা জিনিসটা যত দিন ধর্ম হয়ে না দাঁড়ায়, ততদিন তার মধ্যে খানিকটা ফাঁকি থেকে যায়।'

'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের নয়ের অধ্যায়ে রমেশের স্বগত ভাবনায় শরৎচন্দ্র লিখেছেন—'আমাদের বাঙালী জাতির আর কিছু যদি না থাকে ত নিভৃত গ্রামগুলিতে সেই শান্তি-স্বচ্ছন্দতা আজও আছে, যাহা বহু জনাকীর্ণ শহরে নাই। সেখানে স্বল্পে সন্তুষ্ট সরল গ্রামবাসীরা সহানুভূতিতে গলিয়া যায়, একজনের দুঃখে আর একজন বুক দিয়া আসিয়া পড়ে, একজনের সুখে আর একজন অনাহূত উৎসব করিয়া যায়। শুধু সেইখানে, সেই সব হৃদয়ের মধ্যেই এখনো বাঙালীর সত্যকার ঐশ্বর্য অক্ষয় হইয়া আছে।' এটাকে দূর থেকে পল্লীবাংলার চিত্র চিন্তা করাই বলেছেন শরৎচন্দ্র। রমেশের মোহভঙ্গ ঘটেছে গ্রামীণ কলহ চিত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটায়। তাই তাঁকে বলতে হল—'হায় রে! এ কি ভয়ানক ভ্রান্তি! তাহার শহরের মধ্যেও যে এমন বিরোধ,

এই পল্লীশ্রীকাতরতা চোখে পড়ে নাই!' নাগরিক জীবনে পল্লীজাত যুবকের নিখুঁত ও নিপুণ ছবি ফুটিয়ে বলছেন—'নগরের সজীব-চঞ্চল পথের ধারে যখনই কোনো পাপের চিহ্ন তাহার চোখে পড়িয়া গিয়াছে, তখনই সে মনে করিয়াছে, কোনোমতে তাহার জন্মভূমি সেই ছোট্ট গ্রামখানিতে গিয়া পড়িলে সে এই সকল দৃশ্য হইতে চিরদিনের মতো রেহাই পাইয়া বাঁচিবে।' এবং এই পরিত্রাণের স্বপ্ন-কল্পনার কারণ স্বরূপ শরৎচন্দ্র লিখেছেন—'সেখানে যাহা সকলের বড়—সেই ধর্ম আছে এবং সামাজিক চরিত্রও আজিও সেখানে অক্ষুণ্ণ হইয়া বিরাজ করিতেছে।' কিন্তু রমেশের ঘটেছে মোহভঙ্গ। তাই বলছেন—'হা ভগবান! কোথায় সেই চরিত্র? কোথায় সেই জীবন্ত ধর্ম আমাদের এই সমস্ত প্রাচীন নিভৃত গ্রামগুলিতে? ধর্মের প্রাণটাই যদি আকর্ষণ করিয়া লইয়াছ, তাহার মৃতদেহটাকে ফেলিয়া রাখিয়াছ কেন? এই বিবর্ণ বিকৃত শবদেহটাকেই হতভাগ্য গ্রাম্য সমাজ যে যথার্থ ধর্ম বলিয়া প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিয়া তাহারই বিষাক্ত পুতিগন্ধময় পিচ্ছিলতায় অহর্নিশি অধঃপথেই নামিয়া চলিতেছে। অথচ সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক পরিহাস এই যে, জাতিধর্ম নাই বলিয়া শহরের প্রতি ইহাদের অবজ্ঞা অশ্রদ্ধারও অন্ত নাই।'

বিভিন্ন চরিত্রের বিচিত্র সংঘাত-সংঘর্ষে শরৎচন্দ্র যে মৌলবক্তব্যটিকে স্থাপন করলেন তা হল তাঁর ব্যক্তিজীবনের উপলব্ধ সত্য। তাই তাঁর বক্তব্য খুব স্পষ্ট করে এবং চরিত্রচিত্রণ অত্যন্ত বলিষ্ঠ রেখায় অঙ্কিত করতে পেরেছিলেন। শহর এবং গ্রাম, নাগরিক মানুষ এবং গ্রামীণ মানুষ—উভয়েই যথার্থ স্বরূপেই আত্মপ্রকাশ করেছে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে। এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে শরৎচন্দ্রের দরদী মানসিকতা এবং সমাজ ও স্বদেশ ভাবনার সাহিত্য-স্বরূপ।

আপন ভাষাসাহিত্য স্বদেশীভাবনায় সমৃদ্ধ হয়। শরৎচন্দ্র বললেন মাতৃভাষা থাকলেই সাহিত্য হবে চিন্তার বিকাশে। চিন্তা আসে নিজের নিজের মাতৃভাষাকে বাহন করেই। অপরের ভাষায় নয়। চিন্তার স্থায়ীরূপ তো ভাষাসাহিত্যে। তিনি বলছেন—'যাহা সত্য বলিয়া মনে হইবে অন্তরের সহিত যাহাকে সুন্দর বুঝিবেন, নিজের সাধ্যমত সেই পথ ধরিয়াই চলিবেন—তারপরে ফল ভবিষ্যতের হাতে।' শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন বেঙ্গল ক্লাবের সভায় 'মাতৃ-ভাষা ও সাহিত্য' নামে যে প্রবন্ধটি পাঠ করেন সেটিকে ১৩২১ সালের আষাঢ় মাসের 'যমুনা' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। সৎসাহিত্য রচনার কথা উল্লেখ করে

চিরকালীন আদর্শের অনুসরণযোগ্য ভাব ও ভাবনার ইংগিত দিলেন উপসংহারে —'হৃদয়ের মধ্যে এই সত্য জাগাইয়া রাখিয়া সাহিত্যসেবা করুন, যেন আপনার সেবা মাতৃভাষার দ্বার দিয়া স্বদেশবাসীকে কল্যাণের পথে লইয়া যায়।'

১৩৩৫ সালের ভাদ্র মাসে শরৎচন্দ্রের ৫৩তম জন্মদিন উপলক্ষে কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে দেশবাসীর পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। শরৎচন্দ্র সেই অভিনন্দন সভায় উপস্থিত হয়ে এক অভিভাষণ পাঠ করেন। তাতে বললেন —'এ শুধু আমাকে অবলম্বন করে সাহিত্যলক্ষ্মীর পদতলে ভক্ত মানুষের শ্রদ্ধানিবেদন।' তিনি সাহিত্যকে মহাকালের প্রেক্ষাপটে এক অনন্ত সৃষ্টির বিচিত্র স্রোতধারা রূপে উপলব্ধি করেছেন। তাই ব্যক্তিগত না ভেবে সমষ্টিগত ভাবে সৃজনীস্রোতের অংশভাগী ভাবছেন নিজেকে। তাই বললেন— 'যে কাল আজও আসে নি, সেই অনাগত ভবিষ্যতে আমার লেখার মূল্য থাকবে, কি থাকবে না, সে আমার চিন্তার অতীত। আমার বর্তমানের সত্যোপলব্ধি যদি ভবিষ্যতের সত্যোপলব্ধির সঙ্গে এক হয়ে মিলতে না পারে, পথ তাকে তো ছাড়তেই হবে। তার আয়ুষ্কাল যদি শেষ হয়েই যায় সে শুধু এই জন্যই যাবে যে, আরও বৃহৎ, আরও সুন্দর, আরও পরিপূর্ণ সাহিত্যের সৃষ্টিকার্যে তার কঙ্কালের প্রয়োজন হয়েছে।' এর জন্যে তিনি কোনো মনে মনে ক্ষোভ প্রকাশ তো করছেনই না বরং বলে উঠেছিলেন—'আমার দেশে, আমার ভাষায় এত বড় সাহিত্যই জন্মলাভ করুক যার তুলনায় আমার লেখা যেন একদিন অকিঞ্চিৎ-কর হয়েই যেতে পারে।' একটা আশাবাদী অথচ নবীন বরণের মানসিকতা।

শরৎচন্দ্র বহুভাবে বলেছেন যে দেখা মানুষদের সাহচর্যে তিনি অনেক কিছুই উপলব্ধি করেছেন। যার রসদ নিয়েই তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি। তাই সিদ্ধান্তে এসেছেন—'ত্রুটি, বিচ্যুতি, অপরাধ, অধর্মই মানুষের সবটুকু নয়। মাঝখানে তার যে বস্তুটি আসল মানুষ—তাকে আত্মা বলা যেতেও পারে সে তার সকল অভাব, সকল অপরাধের চেয়েও বড়। আমার সাহিত্য রচনায় তাকে যেন অপমান না করি।' শরৎচন্দ্র অতি সচেতন ভাবেই যেন আপন সাহিত্যের মহৎগুণটিকে অকপটে স্বীকার করলেন। এমন চরিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন যাদের সমাজে স্থান খুবই নিচুতলায়। কিন্তু তাদের মধ্যে তিনি এমন এক মহৎগুণের ইঙ্গিত দিলেন যাতে পাঠক—হায় হায় করে ওঠে এবং বলে—আহা এমন মহৎভাবনা যার সে কি নিচুতলায় থাকতে পারে, ঘটনাচক্রে সমাজের নিচের তলায় চলে যেতে হয়েছে মাত্র। পাঠকের মনে সহানুভূতি আকর্ষণের

এক অপূর্ব দক্ষতা ছিল শরৎচন্দ্রের। তাই তাঁর উপলব্ধি প্রবাহিত এই পথে—'মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা জন্মে যায় আমার লেখা কোনো দিন যেন না এত বড় প্রশ্রয় পায়। কিন্তু অনেকেই তা আমার অপরাধ বলে গণ্য করেছেন, এবং যে অপরাধে আমি সবচেয়ে বড় লাঞ্ছনা পেয়েছি, সে আমার এই অপরাধ। পাপীর চিত্র আমার তুলিতে মনোহর হয়ে উঠেছে, আমার বিরুদ্ধে তাঁদের সব চেয়ে বড় এই অভিযোগ।' শরৎচন্দ্র এই অভিযোগ নিজেই মাথা পেতে নিয়ে শুধু বললেন—'সেদিন যাকে সত্য বলে অনুভব করেছিলাম তাকেই অকপটে প্রকাশ করেছি। এ সত্য চিরন্তন ও শাশ্বত কিনা এ চিন্তা আমার নয়, কাল যদি সে মিথ্যা হয়েও যায়—তা নিয়ে কারো সঙ্গে আমি বিবাদ করতে যাব না।'

সব সাহিত্য যে সব কালের নয় তা শরৎচন্দ্র অনেকভাবেই বলেছেন। তিনি বলেছেন সাহিত্য এককালে সৃষ্টি হয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে কিন্তু চির-কালের হয় না। দাশু রায়ের পাঁচালী তাঁর পিতামহের কণ্ঠহার ছিল, কিন্তু এখন? বাসি ফুলের মালা যেন! আবার চণ্ডীদাসের বৈষ্ণব পদাবলী বা কালিদাসের শকুন্তলার আয়ুষ্কাল অতি দীর্ঘ দেখলেও তার একটা সীমানা আসবেই। শরৎচন্দ্র সিদ্ধান্ত করছেন—'কোনো দেশের কোনো সাহিত্যই কখনো নিত্যকালের হয়ে থাকে না।'

ঔপন্যাসিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত ১৩৩৯ সালের কার্তিক সংখ্যা 'বিচিত্রা' পত্রিকায় 'শরৎ বন্দনা' শিরোনামে মুদ্রিত বর্ণাঢ্য অংশে 'শরৎ চন্দ্রের প্রতিভাষণ' রূপে প্রকাশিত হয় একটি রচনা। শরৎচন্দ্র এই ভাষণে তাঁর সাহিত্যভাবনার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অভিব্যক্তি উপস্থাপন করেন। এখানেই প্রদত্ত তাঁর বহুশ্রুত সেই উক্তিটি উদ্ধৃত করি 'সংসারে যারা শুধু দিলে পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষে যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনোদিন ভেবেই পেলে না, সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই,—এদের কাছেও কি ঋণ আমার কম? এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে। তাদের প্রতি কত দেখেছি অবিচার, কত দেখেছি কুবিচার, কত দেখেছি নির্বিচারের দুঃসহ সুবিচার। তাই আমার কারবার শুধু এদেরই নিয়ে। সংসারে সৌন্দর্য সম্পদে ভরা বসন্ত আসে জানি, আনে সঙ্গে তার কোকিলের গান, আনে প্রস্ফুটিত

মল্লিকা-মালতী-জাতি-যূথি, আনে গন্ধ-ব্যাকুল দক্ষিণা পবন, কিন্তু যে আবেষ্টনে দৃষ্টি আমার আবদ্ধ রয়েগেল তার ভিতরে ওরা দেখা দিলে না। ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটলো না। সে দারিদ্র্য আমার লেখার মধ্যে চাইলেই চোখে পড়ে।' শরৎচন্দ্র আপন অনুভূতির উৎসসন্ধানে আপনিই পরিক্রমণ করেছেন এখানে। কিন্তু যে আক্ষেপের সুর ব্যক্তিত করলেন তাতে রবীন্দ্রনাথের 'ঐকতান' কবিতার একটি সুপরিচিত ছত্র মনে করিয়ে দেয়—'আমার কবিতা জানি আমি, গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।'

সেইহেতু জন্মদিনের এই প্রতিভাষণেই লিখেছিলেন—'এ জীবনে যাদের তত্ত্ব খুঁজে মেলে নি স্পর্দ্ধিত অবিনয়ে তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার অপরাধও আমার নেই। তাই সাহিত্যসাধনার বিষয়-বস্তু ও বক্তব্য আমার বিস্তৃত ও ব্যাপক নয়, তারা সংকীর্ণ, স্বল্পপরিসরবদ্ধ। তবুও এটুকু দাবি করি, অসত্যে অনুরঞ্জিত করে তাদের আজও আমি সত্যভ্রষ্ট করি নি।' এবং সেদিন গর্বভরেই শরৎচন্দ্র বললেন—'আমার সাহিত্যসাধনা তাই চিরদিন স্বল্পপরিধি-বিশিষ্ট। হয়ত, এ আমার ত্রুটি, হয়ত এই আমার সম্পদ'।

সাহিত্যিকের জীবনধর্মে এবং সাধনকর্মে অবশ্য আচরণীয় একটি অকৃত্রিম সত্যবাণী শরৎচন্দ্র প্রদান করেছেন, যেখানে বলছেন—'প্রতি সাহিত্যসাধকের অন্তরেই পাশাপাশি বাস করে দুজনে,—তার একজন হলো লেখক, সে করে সৃষ্টি, আর অন্যজন হলো তার সমালোচক, সে করে বিচার। অল্প বয়সে লেখকই থাকে প্রবলপক্ষ,—অপরকে সে মানতে চায় না। একজন পদে পদে যতই হাত চেপে ধরতে চায়, কানে কানে বলতে থাকে,—পাগলের মতো লিখে যাচ্ছো কি, থামো একটুখানি,—প্রবল পক্ষ ততই সবলে হাত দুটো তার ছুঁড়ে দিয়ে চালিয়ে যায় তার নিরঙ্কুশ রচনা। বলে আজ তো আমার থামবার দিন নয়,—আজ আবেগ ও উচ্ছ্বাসের গতি বেগে ছুটে চলার দিন। সেদিন খাতায় পাতায় পুঁজি হয় বেশি, স্পর্দ্ধা হয়ে ওঠে অভ্রভেদী। সেদিন ভিৎ থাকে কাঁচা, কল্পনা হয় অসংযত উদ্দাম,—মোটা গলায় চেঁচিয়ে বলাটাকেই সেদিন যুক্তি বলে ভ্রম হয়। সেদিন বইয়ের-পড়া ভালো-লাগা-চরিত্রের পরিস্ফীত বিকৃতিকেই সদম্ভে প্রকাশ করাকে মনে হয় যেন নিজেরই অনবদ্য মৌলিক সৃষ্টি।'

এটি প্রতিটি লেখকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং তাঁদের সাহিত্যসাধনার প্রথম প্রেরণাকালের নির্ভেজাল উক্তি, এরই মধ্যে দিয়ে জীবনবোধ ও

অভিজ্ঞতার রসবে পরিণতসৃষ্টির সাফল্য আসে। শরৎচন্দ্রের পরিচয় তাঁর 'কোরেল' গল্পের মধ্যে নয় 'শ্রীকান্ত' বা 'শেষ প্রশ্নে', 'দেবদাস' বা 'চন্দ্রনাথে', 'রামের সুমতি' বা 'মেজদিদি'তে।

আপন সাহিত্যের আপনি সমালোচক হওয়ায় অপূর্ব অভিব্যক্তিটি সুন্দর ভাবে এবং সহজভঙ্গিতে শরৎচন্দ্র বিবৃত করলেন। নিজের সাহিত্যসৃষ্টি প্রারম্ভে সাময়িক ধীরগতিতে প্রকাশ পেলেও কালে উৎসারিত হয়েছে উৎকৃষ্ট ফসল রূপে, সার্থক সম্পদরূপে। তখন সৃষ্টি যথার্থ অভিজ্ঞতার রসে সঞ্জীবিত হয়।

এক সময় রবীন্দ্রনাথ 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় লিখেছিলেন—

'ঘটে যা তা সব সত্য নহে, কবি তব মনোভূমি
রামের জনম স্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।'

শরৎচন্দ্র আগের উল্লেখ করা প্রতিভাষণে অনুরূপ ভাবেই লিখলেন—'সংসারে সংঘটিত ঘটনাই কেবল সাহিত্যে সত্য নয়, এবং সত্য বলেই তা সাহিত্যের উপাদানও নয়। ওরা শুধু ভিত্তি এবং ভিত্তি বলেই থাকে মাটির নীচে সংগোপনে,—থাকে অন্তরালে।' শরৎচন্দ্র আপন দীনতার কথা এখানে একান্তই বৈষ্ণববিনয় সুলভ ভঙ্গিতে উল্লেখ করলেও তিনি তাঁর প্রদত্ত প্রতিভাষণের উপসংহার টেনেছেন এইভাবে—'ধনীর অজস্র ঐশ্বর্য নাই-বা হলো, বাক্‌দেবীর অর্ঘভাণ্ডারে ঐ স্বল্প-সঞ্চয়টুকু রেখে যাবার জন্যই আমার আজীবন সাধনা।'

শরৎচন্দ্র ১৯২২ সালের ১৪ই জুলাই হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতিত্ব পরিত্যাগ কালে একটি সভা আহ্বান করে লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। সেই ভাষণ 'আমার কথা' রূপে 'স্বদেশ ও সাহিত্য' গ্রন্থে সংকলিত হয়। তারই একস্থানে লিখছেন—'আত্মবঞ্চনা অনেক করা গেছে, আর তাতে উত্তম নেই। জড়ের মতো নিশ্চল হয়ে জন্মগত অধিকারের দাবী জানাতেও আর যেমন আমার স্বর ফোটে না, পরের মুখেও তত্ত্বকথা শোনবার ধৈর্য্য আর আমার নেই। আমি নিশ্চয় জানি, স্বাধীনতার জন্মগত অধিকার যদি কারও থাকে, তা সে মনুষ্যত্বের, মানুষের নয়। অন্ধকারের মাঝে আলোকের জন্মগত অধিকার আছে দীপশিখার, দীপের নয়; নিবানো প্রদীপের এই দাবী তুলে হাঙ্গামা করতে যাওয়া শুধু অনর্থক নয়, অপরাধ,—সকল দাবী দাওয়া উত্থাপনের আগে এ কথা ভুলে গেলে কেবল ইংরাজ নয়, পৃথিবীসুদ্ধ লোক আমোদ অনুভব করবে।'

জীবনের তাৎপর্যের ব্যাখ্যায় এবং জীবনদর্শনের স্বরূপ প্রকাশে সাহিত্যিক

তাঁর আপন সৃজনী প্রতিভায় উপলব্ধ সত্যকে নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন। শরৎচন্দ্র উপরের উক্তির মধ্যে এমনি একটি অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন। তিনি এই সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে গতির ইঙ্গিতও দিয়েছেন। তাই লিখছেন—'সংসারের সমস্ত শক্তিই তরঙ্গ গতিতে অগ্রসর হয়। তাই তার উত্থান পতন আছে, চলার বেগে যে আজ নিচে পড়েছে, কাল সেই আবার উপরে উঠবে, নইলে চলা তার সম্পূর্ণ হবে না। পাহাড় গতিহীন, নিশ্চল, তাই তার শিখর দেশ একস্থানে উঁচু হয়েই থাকে, তাকে নামতে হয় না। কিন্তু বায়ু-তাড়িত সমুদ্রের সে ব্যবস্থা নয়—তার উঠা পড়া আছে ; সে তার লজ্জার হেতু নয়, সেই তার গতির চিহ্ন, তার শক্তির ধারা। তখনি সে কেবল উঁচু হয়ে থাকতে চায় যখন জমে বরফ হয়ে ওঠে।' শরৎচন্দ্র সেদিন যে প্রসঙ্গে এ কথা বলেছেন তা সর্বকালের, সর্বদেশের এবং সর্বজনের প্রণিধানযোগ্য কথা। শাশ্বত সত্যে উপলব্ধির উপকথা।

'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি' প্রবন্ধেও এমনি একটা গতিবেগের ইশারাই শরৎচন্দ্র তো প্রকাশ করে বলেছেন—'শত কোটি বর্ষের প্রাচীন পৃথিবী আজও তেমনি বেগেই ধেয়ে চলেছে, মানব-মানবীর যাত্রাপথের সীমা আজও তেমনি সুদূরে। তার শেষ পরিণতির মূর্তি তেমনি অনিশ্চিত, তেমনি অজানা।'

রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি'র ৬৫ সংখ্যক গীতিকবিতায় এমনি ভাব নিয়েই বলেছিলেন—

'কতই নামে ডেকেছি যে,
কতই ছবি এঁকেছি যে,
কোন আনন্দে চলেছি, তার
ঠিকানা না পেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।'

শরৎচন্দ্র নবীন সাহিত্যের অগ্রগতিকে স্বীকার করে নিয়েই বলছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর চারদিকের সাহিত্যিকমণ্ডলী আজ নেই কিন্তু 'তাঁদের প্রদর্শিত পথ, তাঁদের নির্দিষ্ট ধারার সঙ্গে নবীন সাহিত্যিকদের অনৈক্য ঘটেছে—ভাষা, ভাব ও আদর্শে। এমন কি, প্রায় সকল বিষয়েই। এইটেই অধঃপথ কিনা, এই কথাই আজ ভেবে দেখবার।'

শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিতে সমকালীন সাহিত্যসৃষ্টি একটা উদ্দীপনারই ভাব নিয়ে এবং যার ফলে প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের সংঘর্ষ। এটা নিছক সংস্কার বদ্ধ

মানসিকতার জন্যেই ঘটছে, নবীনবয়সের মন থাকলে ঘটতো না। তাই লিখছেন—'মানুষ তার সংস্কার ভাব নিয়েই ত মানুষ ; এবং এই সংস্কার ও ভাব নিয়েই প্রধানতঃ নবীন সাহিত্যসেবীর সহিত প্রাচীনপন্থীর সংঘর্ষ বেধে গেছে।' শরৎচন্দ্র খুব স্বল্প কথায় তাঁর আক্ষেপও জানালেন এইভাবে—'...যাঁরা জীবিত, ব্যথায় বেদনায় হৃদয় যাঁদের জর্জরিত, তাঁদের আশা, তাঁদের কামনা কি কিছুই নয় ? মৃতের ইচ্ছাই কি চিরদিন জীবিতের পথরোধ করে থাকবে ? তরুণ সাহিত্য ত শুধু এই কথাটাই বলতে চায় !' কিন্তু সাহিত্যিকদের চিরন্তন দৃষ্টি কোথায় হবে ও কেমন হবে তার দিকেই যেন পথনির্দেশ দিয়ে শরৎচন্দ্র এই প্রবন্ধেই লিখলেন—'আজ যাকে চোখে দেখা যায় না, আজও সে এসে পৌঁছেনি, তারই কাছে তার পুরস্কার, তারই কাছে তার সম্বর্ধনায় আসন পাতা আছে।' এখানে মহাকালের বিচারকেই স্বীকৃতি জানালেন। কারণ জানতেন আগামী কালের পাঠকই কষ্টিপাথর।

জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে উপাদান হয় সংগৃহীত, তার পর সাহিত্যিক প্রজ্ঞার আলোকে আপন সৃষ্টির মাধুর্যে তিনি বিশেষ রচনায় তা প্রকাশ করেন। জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করে সেই সৃষ্টি কারণ জীবনের ছবি নিয়ে কথার ছবি ফুটিয়ে তোলা। শরৎচন্দ্রের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্পদে-সমৃদ্ধ সাহিত্যিকসত্তার তাই এত সার্থক হয়েছে, এত জীবন্ত হয়েছে তাঁর সৃষ্ট চরিত্র আর চেতনা, পরিবেশ আর প্রকাশ। শরৎ-সাহিত্য শিল্পের সুষমায় শ্রীমণ্ডিত কারণ আলোকচিত্র গ্রহণ নয় যথার্থ শিল্পীর তুলির টানে জীবনের ও জগতের যথাযথ চৈতন্যোদয়ের চিত্র। বলা আছে যত, না-বলার জন্যেও থাকে তত—কল্পনার অবকাশ পাঠকের মননেও। শুধু দেখা নয়, না-দেখার গভীরেও কথাশিল্পী কল্পনায় উধাও যাত্রা করান। সেখানেই কথাশিল্পের অথবা যথার্থ সাহিত্যের সার্থক প্রয়োগকলা। শরৎচন্দ্র এই বিষয়টিকে মৌল ভাবনায় রেখেই আপন অনুভূতির গভীরে ডুব দিয়েছিলেন অবশ্যই। না হলে এমন দরদী, এমন মনোহরণকারী সৃষ্টির সুষমা কেমন করে ফোটে, কেমন করে পাঠকহৃদয়ে রসসঞ্চার করে !

পাঠকের জয়তিলক ললাটে নিয়ে শরৎচন্দ্র তাঁর স্বল্পকালীন সাহিত্যসাধনায় এক অদ্বিতীয় শিল্পী। এত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা হয় যে এখনকার দিনে ভাবলেও অবাক লাগে। 'বড়দিদি' গল্পটি 'ভারতী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশের কালে লেখকের নাম মুদ্রিত হয় নি। অনেকেরই ধারণা হয় গল্পটি

রবীন্দ্রনাথেরই হবে। শেষ অংশ প্রকাশকালে নাম মুদ্রিত হল—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাঙালীপাঠক অবাকচোখে চিনলো তাঁকে। আর, এবং একেবারে হৃদয়রাজ্যে আসন পাতা সেদিনই। আমৃত্যু সেই পাঠকের ভালোবাসা পেয়েছিলেন তিনি।

এই দিক থেকে এক দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী শরৎচন্দ্র। তাঁর সাহিত্য-পাঠক তাঁর রচনাকে এমন আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেন যে তাঁরা তাঁর সকল গল্পের সকল চরিত্র পাঠ করেই শরৎবাবুর ব্যক্তিজীবনে ডুব দিতে চাইতেন। কারণ 'ভারতবর্ষ'এর পৃষ্ঠায় শ্রীকান্তের ভ্রমণকথা পড়ে তো পাঠক ধরেই ফেলে-ছিলেন যখন জানলেন শরৎচন্দ্রের জীবন ও রচনা এর মধ্যে একাত্ম হয়েই আছে। তখন সব গল্পেরই মধ্যে সন্ধান চলে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনকে অনুসন্ধানের।

সাহিত্য কিন্তু তাই বলে কেবল জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়েই সবটা নয়। শরৎচন্দ্র জীবন্ত হয়ে উঠতে লাগলেন তাঁর সমস্ত গল্পের মধ্যেই কারণ বাঙালী পাঠক ধরেই নিয়েছিলেন যে শরৎবাবু যা লেখেন তা সবই তাঁর ব্যক্তি অভিজ্ঞতার ছবি মাত্র। এটাতে লাভবান হয়েছিলেন লেখক ঠিকই কারণ পাঠক লেখাটি পড়ার আগেই মনে মনে ধারণা করে নিচ্ছিলেন যে লেখকের জীবনেরই নানা ঘটনার মধ্যেকার একটি অধ্যায়ই যেন পাঠ করছেন। এর ফলে পাঠক সত্যগন্ধ অর্থাৎ লেখকের ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যগন্ধেরই আঘ্রাণ পাবেন তাঁর কাহিনীতে এমনই যে এক ধারণার বশবর্তী হয়েই পাঠ করেন তাঁর রচনা। লেখকের তাই এটা হয়েছিল যেন এক উপরি পাওনা।

কিন্তু আর একটি বিপদও হয় শরৎবাবুর ব্যক্তিজীবনে এই ধারণার ফলে। তাঁর জীবিত কালেই তাঁর জীবনীর বিষয়ে নানা গালগল্প রচনা হতে থাকে। নানা জনে নানা কথা মনগড়া করে এমনভাবে প্রচার করতে থাকেন যে তা খুবই অস্বস্তিকর। অবশ্য এটাকে জনপ্রিয়তার নগদ খেসারৎ হিসেবেই গণ্য করা চলে।

তাঁর সাহিত্য ও জীবন যে এক জায়গায় মিলেজুলে ছিল সে কথা তাঁর নিকট সান্নিধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁদের কথায় অনেক ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তাঁর সাহিত্যেও যা প্রকাশ পায় নি জীবনে তা ছিল এবং যা সাহিত্যেরও সামগ্রী হবার যোগ্য সেই সমস্ত অভিজ্ঞতাকে তো তিনি স্থায়ী রচনায় রেখে যেতে পেরেছেন বলে মনে হয় না কারণ তাঁর মৃত্যু তো আসে আকস্মিক এবং তিনি বেশ কুঁড়ে ধরনের লেখক ছিলেন। খুঁৎ খুঁতেও বলা

চলে। ভীষণ সংযম নিয়ে লিখতেন এবং বারবার পরিমার্জনা করতেন বলেও শোনা যায়। চরম সার্থকতার দিকেই ছিল তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ।

শরৎচন্দ্র 'তরুণের বিদ্রোহ' নামের অভিভাষণটিতে নিজের সম্বন্ধে বলেছেন—'পেশা আমার সাহিত্য'। তিনি বলেছিলেন—'রাজনীতি-চর্চা হয়ত আমার অনধিকার চর্চা'। নিজের প্রধান ভূমিকাটিকে তিনি তখন অর্থাৎ ১৯২৯ সালে ঠিকই ধরে নিয়েছিলেন। তাঁর এই ভাষণের প্রায় প্রথম দিকে নিজস্ব সাহিত্যের কথাও একটু যা বলেছেন তা এখানেই উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন—'আরও একটা কথা প্রথমেই বলা দরকার, সে আমার নিজের লেখার সম্বন্ধে। আমার বইগুলির সঙ্গে যারা পরিচিত, তারাই জানে আমি কোনো দিন কোনো ছলেই নিজের ব্যক্তিগত অভিমত জোর করে কোথাও গুঁজে দেবার চেষ্টা করিনি। কি পারিবারিক, কি সামাজিক, কি ব্যক্তিবিশেষের জীবন-সমস্যায় আমি শুধু বেদনার বিবরণ, দুঃখের কাহিনী, অবিচারের মর্মান্তিক জ্বালার ইতিহাস, অভিজ্ঞতার পাতার উপরে পাতা কল্পনার কলম দিয়ে লিপিবদ্ধ করে গেছি—এইখানেই আমার সাহিত্য-রচনার সীমারেখা।' শরৎচন্দ্র বার বার তাঁর সাহিত্যকে জীবন-অভিজ্ঞতার ফসল রূপে চিহ্নিত করেছেন এবং বলেছেন—'জ্ঞানতঃ কোথাও একে লঙ্ঘন করতে আমি নিজেকে দিইনি। সেই জন্যেই লেখার মধ্যে আমার সমস্যা আছে, সমাধান নেই; প্রশ্ন আছে, তার উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ এ আমার চিরদিনের বিশ্বাস যে সমাধানের দায়িত্ব কর্মীর, সাহিত্যিকের নয়। কোথায় কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা মন্দ; বর্তমান কালে কোন্ পরিবর্তন উপযোগী, এবং কোন্‌টার সময় আজও আসেনি, সে বিবেচনার ভার আমি সংস্কারকের উপরে রেখেই নিশ্চিন্ত মনে বিদায় নিয়েছি; আজকে এই কয় ছত্র লেখার মধ্যেও তার অন্যথা করিনি। এখানেও সেই সমস্যা আছে, তার জবাব নেই।'

সাহিত্যে জীবনসমস্যা উপস্থাপিত হয়, সমাজ-সংকট প্রতিফলিত হয়—যার মধ্যে দিয়ে পাঠককূল উপলব্ধির প্রান্তে এসে হৃদয়ঙ্গম করে মৌল বক্তব্যটিকে। সাহিত্যিক তাঁর উপলব্ধির উপান্তে এনে পাঠককে সহানুভূতিশীল করেন/সমাজ-সংকট বা জীবনসমস্যার প্রতি। এই সহৃদয়তার বা সহানুভূতির মধ্যেই পাঠকের ঘটে সাহিত্যরসবোধ এবং চৈতন্যোদয়ও।

শরৎচন্দ্র তাঁর জীবনের বিচিত্রমুখী কর্মধারায় ও সাহিত্য ভাবনায় মধ্যেও দেশ ও জাতির একটা সামগ্রিক শরীরকেই উপলব্ধি করে ছিলেন। না হলে

সার্থক উপন্যাস সৃষ্টিও হত না। কারণ দেশের মানুষের কথা বলতে হবে অথচ দেশকে না জেনে তা তো আর হয় না। দেশের মানুষের কাছেও যাবে এই সাহিত্য তাই তাদের মানসচৈতন্যকে এবং মননবৈশিষ্ট্যকে সম্যকভাবে জানার পরই তিনি সৃষ্টির মৌতাতে বুঁদ হয়েছিলেন। 'তরুণের বিদ্রোহ'এর ভাষণের মধ্যে শরৎচন্দ্র বললেন—'এলো জেলে যাবার দিন, এলো আত্মত্যাগের বন্যা। মন্ত্র এলো বাঙ্গালার বাইরে থেকে, অথচ যত চরকা ও যত খাদি সেদিন বাঙ্গালার তৈরী হলো ; যত লোক গেল বাঙ্গালার কারাগারে, যত ছেলে দিলে জীবনের সর্বস্ব বলিদান, সমগ্র ভারতবর্ষে তার জোড়া রইল না। কেন জান? কারণ এই বাঙ্গালার ছেলে যতখানি তার দেশকে ভালোবাসে, হয়ত পাঞ্জাব ছাড়া তার একাংশও ভারতের কোথাও খুঁজে মিলবে না। তাই 'বন্দেমাতরম্'-মন্ত্র সৃষ্টি এই বাঙ্গালায়। এই বাঙ্গালাতে জন্ম নিয়েছিলেন পুণ্যশ্লোক স্বর্গীয় দেশবন্ধু।'

দেশের মানুষের কথা ভাবতে ভাবতে যেমন শরৎচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টি তেমনি ভাষণেও বললেন শুধু কথার বিপ্লব নয় দেশের অন্তর্লোকের বিপ্লব চাই। তাই বলছেন—'কখনও কোনো দেশেই শুধু শুধু বিপ্লবের জন্যেই বিপ্লব আনা যায় না। অর্থহীন অকারণ বিপ্লবের চেষ্টায় কেবল রক্তপাতই ঘটে, আর কোনো ফললাভ হয় না। বিপ্লবের সৃষ্টি মানুষের মনে, অহেতুক রক্তপাতে নয়। তাই ধৈর্য ধরে তার প্রতীক্ষা করতে হয়। ক্ষমাহীন সমাজ, প্রীতিহীন ধর্ম, জাতিগত ঘৃণা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, মেয়েদের প্রতি চিত্তহীন কঠোরতা, এর আমূল প্রতিকারের বিপ্লব-পন্থাতেই শুধু রাজনৈতিক বিপ্লব সম্ভবপর হবে। নইলে অসহিষ্ণু অভিলাষ ও কল্পনার আতিশয্যে তোমাদের ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই দেবে না। স্বাধীনতার সংগ্রামে বিপ্লবই অপরিহার্য পন্থা নয়। যারা মনে করে, জগতে আর সবকিছুরই আয়োজনের প্রয়োজন, শুধু বিপ্লবেরই কিছু চাই না—ওটা শুধু করে দিলেই চলে যায়, তারা আর যত-কিছুই জানুক, বিপ্লব-তত্ত্বের কোনো সংবাদই জানে না। মনে মনে যাঁরা বিপ্লবপন্থী, আমার কথায় হয়ত তাঁরা খুশী হবেন না।'

শরৎচন্দ্র সাহিত্যিক, রাজনীতিক নন। কিন্তু মননশীল এবং চিন্তাবিদ। তাঁর ভাব ও ভাবনা, তাঁর কথা ও কল্পনা প্রতি মুহূর্তেই আবর্তিত হয়েছে এক এবং বহু বিচিত্রধারায়। তার মধ্যে যেমন নিঃস্ব ও নিরক্ষর মানুষের মূক বেদনার ভাষা ফুটেছে তেমনি আবার সংগঠিত ও সাক্ষর মানুষের সরব ঘোষণায়

বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। তিনি যেমন একদিকে আপন সৃষ্টির সাহিত্য-সীমানার কথা বলেছেন তেমনি সামগ্রিক ভাবে দেশ ও জাতির স্বাধীনতার কথাও বলেছেন। শরৎচন্দ্র এইখানেই সমগ্র মানুষের মানুষ এবং যথার্থ দরদী মানুষ। কোনো একটা দিক নিয়েই নয়, সমস্ত দিকেই তাঁর মননধর্মকে, তাঁর চিন্তা ও চেতনাকে সজাগ রেখেছিলেন। তারই পরিচয় 'তরুণের বিদ্রোহ' অভিভাষণটির ছত্রে ছত্রে বিবৃত। তাই তাঁকে বা তাঁর মননধারাকে উপলব্ধির উপায়ে যখনই আমাদের উপস্থাপনার প্রয়োজন হবে তখনই সমগ্রভাবে মানস-পরিমণ্ডলটিকে পর্যালোচনাও অবশ্যকরণীয়।

আমাদের অনেক কথার পরও আসবে দেশের মাটির কথা ও মানুষের কথাই। 'তরুণের বিদ্রোহ' ভাষণটিতে অনেক খাঁটি কথা সেযুগেই শরৎচন্দ্র উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি 'তরুণ-সংঘ' এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের দুটি সত্তাকে বিশেষভাবে চিহ্নীত করেন দ্বিধারায়। তাঁর মনে হয়েছিল—'তরুণ-সংঘের মধ্যে অনেক ছাত্র আছেন এবং ছাত্র না হয়েও এমন অনেকে আছেন, যাঁরা খোলাখুলিভাবে রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতে পারেন না। বাধা ও নিষেধ বহু প্রকার আছে, তাদের জন্য একটা আবরণ দরকার। কিন্তু আবরণ দিয়ে—কৌশলে ও ছলনার আশ্রয়ে, কোনো দিন সত্যকার সিদ্ধিলাভ হয় না। কাজ করতেও চাই, উপরওয়ালার চোখেও ধূলো দিতে চাই—এ দুটো চাওয়া একসঙ্গে পাওয়া যায় না, অতএব যুব-সংঘকে স্পষ্ট করে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য দেশের কাছে ব্যক্ত করতে হবে। ভয় করলে চলবে না। কিন্তু তা যারা পারে না, তাদের দিয়ে এটাও হবে না,—সেটাও নিষ্ফল হবে।'

'পথের দাবী' উপন্যাসের একত্রিশ অধ্যায়ে অপূর্বের মুখ দিয়ে শরৎচন্দ্র যেন যুবশক্তির শপথ বাক্যই পাঠ করিয়েছেন। সেখানে গাঢকণ্ঠে অপূর্ব বলছে—'এখন থেকে আমি দেশের কাজে, দশের কাজে, দীন-দরিদ্রের কাজেই আত্ম-নিয়োগ করব।···কলকাতায় আমার বাড়ি, শহরেই আমি মানুষ, কিন্তু শহরের সঙ্গে আর আমার কিছু মাত্র সম্বন্ধ রইল না। এখন থেকে পল্লীসেবাই হবে আমার একমাত্র ব্রত। একদিন কৃষিপ্রধান ভারতের পল্লীই ছিল প্রাণ, পল্লীই ছিল তার অস্থি-মজ্জা-শোণিত। আজ সে ধ্বংসোন্মুখ। ভদ্রজাতি তাদের ত্যাগ করে শহরে এসেছে, সেখান থেকে তাদের অহর্নিশি শাসন করে, এবং শোষণ করে। এ ছাড়া আর কোনো সম্বন্ধ-বন্ধন তারা রাখে নি। না রাখুক, কিন্তু চিরদিন যারা এঁদের মুখের অন্ন এবং পরনের বস্ত্র যুগিয়ে দেয়, সেই

কৃষককুল আজ নিরন্ন, নিরক্ষর এবং নিরুপায় হয়ে মৃত্যুপথে দ্রুতবেগে চলেছে। এখন থেকে আমি তাদের কল্যাণেই আত্মনিয়োগ করব।' শরৎচন্দ্রের দেশ ও জাতির এমন একটা চিন্তা-ভাবনার রূপ এখানে প্রকাশিত যা সেদিনের বাংলা ও বাঙালীর একান্ত আপন কথার মতোই। তাই আবার ডাক্তারের মুখে শরৎচন্দ্রের ভাষা ফুটেছে—'যা ভুল তা তেত্রিশ কোটী লোকে মিলে বললেও ভুল। বরঞ্চ এই শিক্ষিত ভদ্র জাতির চেয়ে লাঞ্ছিত, অবমানিত, দুর্দশাগ্রস্ত সমাজ বাংলাদেশে আর নেই। তার উপরে মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে তাদের ভরাডুবি করাতে চাও কেন? পরদেশের সকল যুক্তি এবং সকল সমস্যাই কি নিজের দেশে খাটে ভেবেচ? বাইরের অনাচার যখন পলে পলে সর্বনাশ নিয়ে আসচে, তখন আবার অন্তর্বিদ্রোহ সৃষ্টি করতে চাও কিসের জন্তে? অসন্তোষে দেশ ভরে গেল,—স্নেহের বাঁধন, শ্রদ্ধার বাঁধন চূর্ণ হয়ে এলো কিসের জন্তে জানো? তোমাদের দু-দশ জনের দোষে,—শিক্ষিতের বিরুদ্ধে শিক্ষিতের অভিযানে।' নির্ভেজাল কথা, খোলামেলা কথা বলিয়েছেন শরৎচন্দ্র তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মুখে এবং একটা দরদী সুরেই। 'শিক্ষিতের বিরুদ্ধে শিক্ষিতের অভিযান'—নিদারুণ সত্যি কথা। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের চিরকালীন সংঘর্ষ। দেশের মধ্যে যে আত্মহননের বিষ-ক্রিয়া চলেছিল তারই বুদ্ধিদীপ্ত উপলব্ধি, মননশীল ব্যাখ্যা। তিনি বলিয়েছেন তাই—'নিজেদের বিপক্ষে নিজেদের দুর্নাম ঘোষণার মধ্যে একটা নিরপেক্ষ স্পষ্টবাদিতার দম্ভ আছে, এক প্রকার সস্তা খ্যাতিও মুখে মুখে প্রচারিত হয়, কিন্তু এ শুধু ভুল নয়, মিথ্যা। মঙ্গল তাদের তোমরা কর গে, কিন্তু অপরের কলঙ্ক রটনা করে নয়, একের প্রতিকূলে অপরকে উত্তেজিত করে নয়,—বিশ্বের কাছে তাদের হাস্যাস্পদ করে নয়!' তাই শরৎচন্দ্র দেশের কথা তাঁর সাহিত্যে বলেছেন সৃষ্ট চরিত্রের মুখ দিয়েও।

'তরুণের বিদ্রোহ'এর এক জায়গায় শরৎচন্দ্র বললেন—'এই পুণ্যভূমি ত্যাগ-মাহাত্ম্যেই ভরপুর। উচ্চাঙ্গের দর্শনশাস্ত্রে কি আছে জানিনে, কিন্তু সহজ-বুদ্ধিতে মনে হয়, এই ত্যাগের মন্ত্র দিনের পর দিন সর্বসাধারণকে মানুষের ধাপ থেকে নামিয়ে পশুর কোঠায় টেনে এনেছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা করবে কি, অভাব-বোধটাই তাদের শুকিয়ে গেছে। ছোট জাত অস্পৃশ্য—তাতে কি? ভগবান করেছেন! এক বেলায় বেশী অন্ন জোটে না,—কপালের লেখা! এতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। যারা আর একটু বেশী জানে, তারা উদাস চক্ষে চেয়ে বলে, সংসার ত মায়া,—দুদিনের খেলা; এ-জন্মে সন্তুষ্টচিত্তে দুঃখ সয়ে

গেলে, আর-জন্মে মুখ তুলে চাবেন। এক অদৃষ্ট ছাড়া আর কারও বিরুদ্ধে তাদের নালিশ নেই। চাইতে তারা জানে না, চাইতে তারা ভয় পায়। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, শক্তি নেই, স্বাস্থ্য নেই, অভাবের পরে অভাব নিরন্তর যতই চেপে বসে, ততই তারা সহ্য করার বর প্রার্থনা করে।' শরৎচন্দ্রের উপলব্ধির কথা কোনো বাঁধিবুলি নয়। তিনি জীবনভোর জীবনযন্ত্রণা কাকে বলে তা জেনেছেন, বুঝেছেন তবেই লিখেছেন। এই কথারই আশ্চর্য এক বাণী রূপ রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায়—

'অন্ন চাই. প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু.
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্যমাঝারে, কবি
এক বার নিয়ে এস স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।'

কবি যে বিশ্বাসের ছবিটি চাইছেন তাও আমাদের সকলেরই প্রার্থিত। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য ও জীবন, আশা ও আশ্বাস—সব কিছুর মধ্যেই যে দরদ ও অনুভব যে আকুলতা ও আর্তি তা দেশ, মানুষ ও আদর্শ নিয়েই। চিরকালীন কথার সঙ্গে সমকালীনতার প্রসঙ্গেই শরৎচন্দ্রের অনেক চিন্তার ফসল বা তাঁরই মানসলোকের অমূল্য আলেখ্য।

শরৎচন্দ্রের একটা কথা এখানে বারবার উচ্চারণযোগ্য—'এদের বাঁচাবার ভার তোমাদের। এ ভার কি তোমরা নেবে না? জগতের দিকে দিকে চেয়ে দেখ—এ বোঝা কে বয়েছে। তোমরাই ত! শুধু এদেশেই কি তার ব্যতিক্রম হবে? শান্তি-স্বস্তিহীন সম্মানবর্জিত প্রাণ কি একা ভারতের তরুণের পক্ষেই এতবড় লোভের বস্তু?'—এবং তাঁর এ কথাটাই বা কেন উচ্চারিত হবে না?—'স্বাধীনতা শুধু কেবল একটা নামমাত্রই ত নয়!'

'স্বরাজ সাধনায় নারী' প্রবন্ধেও শরৎচন্দ্র বললেন আবার একটা জাগৃতির স্বপ্ন বিভোর কথা। তিনি এখানে আবার জাগরণের আলোকধারা যেন অনুভব করেছেন্। তিনি বলছেন—'আজ আমাদের অনেকেরই ঘুম ভেঙেছে। আমার বিশ্বাস এখন দেশে এমন একজনও ভারতবাসী নেই যে এই প্রাচীন পবিত্র মাতৃভূমির নষ্ট-গৌরব, বিলুপ্ত-সম্মান পুনরুজ্জীবিত না দেখতে চায়। কিন্তু কেবল চাইলেই ত মেলে না, পাবার উপায় করতে হয়। এই উপায়ের পথেই যত বাধা, যত বিঘ্ন যত মতভেদ, এবং এইখানেই একটা বস্তুকে আমি তোমাদের চিরজীবনের পরম সত্য বলে অবলম্বন করতে অনুরোধ করি। এ

কেবল পরের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা। যার যা দাবী তাকে তা পেতে দাও।'

আমাদের জীবনের ও মননের সর্বোতোমুখীবোধের গভীরে শরৎ-সাহিত্যে সব সময় একটি দীক্ষা গ্রহণ হয় এবং শিক্ষার মূলীভূত সত্যের নিকট সান্নিধ্যও ঘটে। সাহিত্যের স্বরূপ ও ধর্ম যেমন লেখক রূপে শরৎচন্দ্র বলেছেন তেমনি স্বরাজ সাধনায় তাঁর মতামতও বেশ উল্লেখযোগ্যই হয়েছে। সাহিত্যকথার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর জীবনকথার বিচিত্রধারায় বর্ণাঢ্য অনুভূতি এবং শাশ্বতও যে তাঁর উপলব্ধি। রমা ও রমেশের বিষয়ে 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র আর-একটু অগ্রণী হলেন না কেন? এ প্রশ্নের চেয়ে তিনি তাঁর সাহিত্যভাবনায় মৌল-বিন্দুতে কোথায় স্থিতধী তার সন্ধানই বোধ হয় সব থেকে যুক্তিযুক্ত। সাহিত্যের উদার অঙ্গনে তাঁর মানস-অভিসার, তিনি শাশ্বত-সাহিত্যেরই যথার্থ রূপকার।

১০ আশ্বিন ১৩৩১ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ নদীয়া শাখার বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত তাঁর সভাপতির অভিভাষণটি 'সাহিত্য ও নীতি' নামে 'স্বদেশ ও সাহিত্য' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। অনেক মূল্যবান কথার মধ্যে তিনি সেদিন বললেন—'বাস্তব অভিজ্ঞতাকে আমি উপেক্ষা করচি নে, কিন্তু বাস্তব ও অবাস্তবের সংমিশ্রণে কত ব্যথা, কত সহানুভূতি, কতখানি বুকের রক্ত দিয়ে এরা ধীরে ধীরে বড় হয়ে ফোটে, সে আর কেউ না জানে আমি ত জানি। সুনীতি দুর্নীতির স্থান এর মধ্যে আছে, কিন্তু বিবাদ করবার জায়গা এতে নেই,—এ বস্তু এদের অনেক উচ্চে। এদের গণ্ডগোল করতে দিলে যে গোলযোগ বাধে কাল তাকে ক্ষমা করে না। নীতি-পুস্তক হবে, কিন্তু সাহিত্য হবে না। পুণ্যের জয় এবং পাপের ক্ষয়, তাও হবে, কিন্তু কাব্যসৃষ্টি হবে না।'

'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' নামে একটি প্রবন্ধ 'বঙ্গবাণী' ১৩৩৪ আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এটিই তিনি 'বিচিত্রা'য় ১৩৩৪ শ্রাবণে রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম' ও ভাদ্রে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'সাহিত্যধর্মের সীমানা' প্রকাশিত হবার পর লিখেছিলেন। শরৎচন্দ্র সেখানে বলছেন—'হৃদয়ের সত্যকার অনুভূতি আনন্দ ও বেদনার আলোড়নে অলঙ্কৃত বাক্যে বিকশিত হইয়া না উঠিলে সে সাহিত্য পদবাচ্য হয় না।' শরৎচন্দ্র এই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের অনেক কথারই সঙ্গে এক মত হতে পারেন নি। তিনি তাই প্রশ্ন করলেন—'সত্যই কি আধুনিক বাংলা সাহিত্য রাস্তার ধূলা পাঁক করিয়া তুলিয়া পরস্পরের গায়ে নিক্ষেপ করাটাকেই সাহিত্যসাধনা জ্ঞান করিতেছে?' এখানে আরো একটি কথা

মনে আসে তবে কি প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক' উপন্যাসের প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল রবীন্দ্রনাথের? শরৎচন্দ্র তো স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন—'কি জানেন তিনি কে আছে তোমাদের খড়্গহস্তা শুচি-ধর্মী অনুরূপা, আর কে আছে তোমাদের বংশীধারী অশুচি-ধর্মী শৈলজা-প্রেমেন্দ্র-নজরুল কল্লোল-কালিকলমের দল? কি করিয়া জানিবেন তিনি কবে কোন্ মহীয়সী-জননী অতি-আধুনিক-সাহিত্যিক দলন করিতে ভবিষ্যৎ মায়েদের সূতিকা-গৃহেই সন্তান-বধের সদুপদেশ দিয়া নৈতিক উচ্ছ্বাসের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, আর কবে শৈলজানন্দ কুলি-মজুরের নৈতিক হীনতার গল্প লিখিয়া আভিজাত্য খোয়াইয়া বসিয়াছে?'

শরৎচন্দ্র সেদিন রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে একেবারে খোলামেলা ভাবেই বললেন —'এ সকল অধ্যয়ন করিবার মত সময়, ধৈর্য এবং প্রবৃত্তি কোনটাই কবির নাই. তাঁহার অনেক কাজ। দৈবাৎ এক-আধটা টুকরা-টাক্‌রা লেখা যাহা তাঁহার চোখে পড়িয়াছে তাহা হইতেও তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছে, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের আব্রুতা এবং আভিজাত্য দুই ই গিয়াছে। শুরু হইয়াছে চিৎপুর রোডের খচো-খচো-খচ্‌কার যোগে একঘেয়ে পদের পুনঃ পুনঃ আবর্তিত গর্জন।' বেশ অধৈর্য এবং উত্তেজিতও বলা যায় শরৎচন্দ্রকে। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শত-শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও যখন তিনি তাঁরই ভাষার মহৎ উত্তুঙ্গের প্রতি কটাক্ষ করছেন। তিনি যেন আধুনিক সাহিত্যিকদের পক্ষ নিয়ে ওকালতিই করছেন এই প্রবন্ধে। তা না হলে তিনি কি করে বললেন তাঁদের তরফ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের উত্থাপিত অভিযোগের বিরুদ্ধ কথা? কি করে বললেন—'আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রতি কবির এত বড় অবিচারে শুধু নরেশচন্দ্রের নয়, আমারও বিস্ময় ও ব্যথার অবধি নাই।'

এখানে শরৎচন্দ্রের ১৩৩১ সালের চৈত্র মাসে মুন্সীগঞ্জে সাহিত্যসভার সভাপতির যে অভিভাষণটি দেন তা 'স্বদেশ ও সাহিত্য' গ্রন্থে 'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি' নামে প্রকাশিত হয়েছে। তার প্রথম দিকে লিখছেন—'একটা জিনিস আমি আনন্দ ও গর্বের সঙ্গে লক্ষ্য করে এসেছি যে, দিনের পর দিন এর পাঠক সংখ্যা নিরন্তর বেড়ে চলেছে। আর তেমনি অবিশ্রান্ত এই অভিযোগেরও অন্ত নেই যে, দেশের সাহিত্য দিনের পর দিন অধঃপথেই নেমে চলেছে। প্রথমটা সত্য, এবং দ্বিতীয়টা সত্য হলে, ইহা দুঃখের কথা, ভয়ের কথা; কিন্তু ইহার প্রতিরোধের আর যা উপায়ই থাক, সাহিত্যিকদের কেবল কটু কথার চাবুক মেরে মেরেই তাঁদের দিয়ে পছন্দ মত ভাল ভাল বই লিখিয়ে নেওয়া যাবে না।'

এই বক্তব্যের পর তিনি লেখকের স্বাধীনতার কথাই যেন বেশি করে বললেন। 'তার কলম বন্ধ করা যেতে পারে, কিন্তু করমায়েসী বই আদায় করা যায় না।' রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম' ও নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'সাহিত্যধর্মের সীমানা' প্রবন্ধ দুটির উত্তরে শরৎচন্দ্র যে প্রবন্ধটি লেখেন সেটি হচ্ছে 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি'। এখানেই তিনি আধুনিক সাহিত্যিকদের পক্ষে সুন্দর যুক্তি দিয়ে বলেছেন রবীন্দ্রনাথের অমূলক ভাবনার কথা। তাই লিখেছিলেন—'তাঁহার নিশ্চয় বিশ্বাস জন্মিয়াছে আধুনিক সাহিত্যে কেবল সত্যের নাম দিয়া নর-নারীর যৌনমিলনের শারীর ব্যাপারটাকেই অলঙ্কৃত করা চলিয়াছে। তাহাতে লজ্জা নাই, শরম নাই, শ্রী নাই, সৌন্দর্য নাই, রস-বোধের বাষ্প নাই,—আছে শুধু ফ্রয়েডের সাইকো-এনালিসিস। অথচ, যে-কোনো সাহিত্যিককেই যদি তিনি ডাকিয়া পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন ত শুনিতে পাইতেন তাহারা প্রত্যেকেই জানে যে, সত্যমাত্রই সাহিত্য হয় না, জগতে এমন অনেক নোংরা সত্য ঘটনা আছে যে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া কোনো মতেই সাহিত্য রচনা করা চলে না।' শরৎচন্দ্রের নিজের ভাষাতেই জানা যাচ্ছে যে সাহিত্যে বিষয়বস্তুর নির্বাচন থাকবে এবং সত্যের সঙ্গে বাস্তবতাও থাকবে। নিছক বাস্তবতাই সাহিত্য নয়। না হলে সব বাস্তব ঘটনাই তো সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়ে উঠতো এখানে সাহিত্যধর্মের প্রতি আনুগত্যই প্রকাশ পেয়েছে।

সাহিত্যের নান্দনিক ব্যাখ্যা বা বৈশিষ্ট্যই বোধ হয় শরৎচন্দ্র এই আলোচনাতেই করলেন। তিনি লিখলেন—'সাহিত্য-সৃষ্টি অনুকরণের মধ্যে নাই। ভালোরও না, মন্দেরও না। হৃদয়ের সত্যকার অনুভূতি আনন্দ ও বেদনার আলোড়নে অলঙ্কৃত বাক্যে বিকশিত হইয়া না উঠিলে সে সাহিত্য পদবাচ্য হয় না। বৃদ্ধ কবির গীতাঞ্জলিও যত বড় কাব্যগ্রন্থ তাঁহার যৌবনের চিত্রাঙ্গদাও ঠিক তত বড়ই কাব্য-সৃষ্টি। লাঞ্ছনার আঘাত ও গৌরবের মালা যেমন করিয়াই তাঁহার শিরে বর্ষিত হউক না। অথচ, অনুভূতিহীন বাক্য যত অলঙ্কৃত হউক ব্যর্থ। পতিতার অনুকরণও ব্যর্থ, গীতাঞ্জলির অনুকরণও ঠিক ততখানিই ব্যর্থ। দেশের সাহিত্যসম্পদ ইহাতে কণামাত্রও বর্ধিত হয় না।' শরৎচন্দ্র এই বিষয়ে আসল কথাটা এইখানে বললেন—'মানুষের মাঝে যে ইহার দুটি ভাগ আছে, একটি দৈহিক এবং অপরটি মানসিক, একটি পাশব ও অন্যটি আধ্যাত্মিক, ইহার কোন্ মহলটি যে সাহিত্যে অলঙ্কৃত করা হইবে এইটিই আসল প্রশ্ন।' সাহিত্যধর্মের সীমারেখা যে টানা যায় না তা শরৎচন্দ্র

মনে মনে বিশ্বাস করতেন বলেই লিখলেন—'সমস্তই নির্ভর করে লেখকের শিক্ষা, সংস্কার, রুচি ও শক্তির উপরে। একজনের হাতে যাহা রসের নির্ঝর অপরের হাতে তাহাই কদর্যতায় কালো হইয়া উঠে। শ্লীল, অশ্লীল, আব্রু, বে-আব্রু এ-সকল তর্কের কথা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার আসল উপদেশটি সকল সাহিত্য সেবীরই সবিনয়ে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করা উচিত।'

শরৎচন্দ্র আবার কবির পক্ষ নিয়েও একটা কথা এর পরই লিখলেন—'নর-নারীর যৌন-মিলন যে সকল রস-সাহিত্যের ভিত্তি, এ সত্য কবি অস্বীকার করেন নাই।' এই প্রসঙ্গে আরো লিখলেন—'বনিয়াদ যত নীচে এবং যতই প্রচ্ছন্ন থাকে অট্টালিকা ততই সুদৃঢ় হয়। ততই শিল্পীর ইচ্ছামত তাহাতে কারুকার্য রচনা করা চলে। গাছের শিকড়, গাছের জীবন ও ফুল-ফলের পক্ষে যত প্রয়োজনীয়ই হউক তাহাকে খুঁড়িয়া উপরে তুলিলে তাহার সৌন্দর্যও যায়, প্রাণও শুকায়।' শরৎচন্দ্র এখানে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অত্যন্ত বিচক্ষণ সাহিত্য-তত্ত্ববিদের মানসিকতা নিয়েই বললেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন সাহিত্যের বলার আর না-বলার সীমারেখা একটা থাকবেই। যতটা বলার তার চেয়ে না বলারও থাকবে অনেকটা যার মধ্যে দিয়ে পাঠক হৃদয়ের সঙ্গে হয় সহৃদয়তার সম্পর্ক। শরৎচন্দ্র মৌলভাবনাকে মেনে নিয়েছেন কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবেই যে বাংলার সাহিত্যে তা আত্মপ্রকাশ ঘটেছে তা বুঝতে পারছেন না যেন বা মানতে চাইছেন না যেন। তাই বললেন—'এ সত্য যে অভ্রান্ত তাহা ত না বলা চলে না। অবশ্য ঠিক এ জিনিসটিই আধুনিক সাহিত্যে ঘটিতেছে কি না সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র।'

শরৎচন্দ্র এই প্রবন্ধে সবচেয়ে যে ভালো কথাটা বললেন, তা হল এই যে—'সাহিত্যের নানা কাজের মধ্যে একটা কাজ হইতেছে জাতিকে গঠন করা, সকল দিক দিয়া তাহাকে উন্নত করা। 'আইডিয়া' পশ্চিমের কি উত্তরের, ইহা বড় কথা নয়, স্বদেশের কি বিদেশের তাহাও বড় কথা নয়, বড় কথা ইহা ভাবার ও জাতির কল্যাণকর কি না। 'বিদেশের আমদানি' কথাটা মুর্গী খাওয়ার অপবাদ নয় যে, শুনিবামাত্রই লজ্জায় মাথা হেঁট করিতে হইবে। অতএব, সাহিত্যিকের শুভবুদ্ধি যদি কল্যাণের নিমিত্তই ইহার আমদানি প্রয়োজনীয় জ্ঞান করে এমন কেহই নাই যে তাহার কণ্ঠরোধ করিতে পারে।' শরৎচন্দ্রের কিন্তু সব সময়েই আধুনিক সাহিত্যিকদের বলিষ্ঠতা ও স্বাধীন-চিত্ততার প্রতি আস্থা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি সাহিত্য ও সাহিত্যিককে

স্বাধীন স্বতন্ত্র ও স্বমহিমায় বিকশিত হবার পক্ষপাত দেখিয়েছেন। সাহিত্যই তাঁর কাছে বড় কথা।

শরৎচন্দ্র খুবই নম্রভাবে আলোচনা করেছিলেন আধুনিক সাহিত্যে অনাচার প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-অভিমত বিষয়ে। তিনি অবশ্য দেশবিদেশে যে ভাবে সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি প্রবাহিত তার উল্লেখ করেই বলেন -'সত্য মাত্রই সাহিত্য হয় না। জগতে এমন অনেক নোঙরা সত্য ঘটনা আছে যে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া কোনো মতেই সাহিত্য রচনা করা চলে না।'

'আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ত' নামক প্রবন্ধ অথবা বলা যায় এটিও তাঁর ১৩৩০ সালের ১৬ আষাঢ় হাওড়া টাউন হলে অনুষ্ঠিত শিবপুর ইনষ্টিটিউটের সাহিত্যসভায় প্রদত্ত ভাষণ, সেখানে বলেছেন—'নাটক নভেলে বাংলাদেশ প্লাবিত হইয়া গেল, এ বুলি কে আবিষ্কার করিয়াছিলেন আমি জানি না. কিন্তু এখন যে-কেহ দেখি আপনাকে বঙ্গ-সাহিত্যের বিচারক বলিয়া স্থির করেন, তিনিই এই বুলি নির্বিচারে আবৃত্তি করিয়া যান, মনে করেন, সমজদার বলিয়া খ্যাতি অর্জন করিবার ইহার চেয়ে বড় পথ আর নাই।' মানুষের সমালোচনা করার ফাঁকা আওয়াজকে তিনি কখনই মূল্য দেন নি। শরৎচন্দ্রের নিকট-সান্নিধ্যের মানুষরা বলেন যে, শরৎচন্দ্র প্রশংসায় যেমন বিগলিত হতেন না তেমনি নিন্দায় বিচলিতও হতেন না। সাহিত্যের খ্যাতির মধ্যে তাই তিনি ফাঁক বা ফাঁকি রাখতে জানতেন না। তিনি মনে করতেন অনেক লেখকের অনেক লেখার মধ্যে থেকেই মহৎ সৃষ্টি আসবে। তাই বললেন—'মেঘদূত, চণ্ডীদাস, গীতাঞ্জলি কোনো সাহিত্যেই ঝুড়ি ঝুড়ি সৃষ্টি হয় না। এবং আবর্জনা থাকে বলিয়াই ইহাদের জন্মলাভ সম্ভবপর হইয়াছে, না হইলে হইত না। আবর্জনার বালাই যে দিন দূর হইবে. সে দিন যাহাকে তাঁহারা সার বস্তু বলিতেছেন. সেও সেই পথেই অন্তর্হিত হইবে। আবর্জনা চিরজীবী হইয়া থাকে না, নিজের কাজ করিয়া সে মরে, সেই তাহার প্রয়োজন. সেই তাহার সার্থকতা। কিন্তু সেই আবর্জনার ভার বহিতে যে দিন দেশ অস্বীকার করিবে সে দিন আনন্দ করিবার দিন নহে. সে দিন দেশের দুর্দিন।'

এক সময় শরৎচন্দ্র উপলব্ধি করলেন যে রবীন্দ্রনাথের পর আমাদের একালের এই বাংলা সাহিত্য বিশ্ব সাহিত্যে স্থান লাভ করেছে এই আত্মতৃপ্তির ঢেউ যেমন একদিকে উঠেছে তেমনি আবার আরেক দিকে কলরব উঠতে শুনেছেন শরৎচন্দ্র যে, বাংলা সাহিত্যে শুধু উপন্যাস শুধু কবিতা ছড়িয়ে

গিয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় বা ইতিহাস-দর্শন চর্চায় বইয়ের প্রকাশ দেখা যাচ্ছে না। শুধু কি তাই? তার ওপর বলা হচ্ছে বঙ্কিম-প্রদর্শিত পথ থেকে আধুনিক বাংলা উপন্যাস ভিন্ন পথে পরিচালিত হচ্ছে যা আক্ষেপের বস্তু। শরৎচন্দ্র লিখছেন—'সম্প্রতি একটা কলরব উঠিয়াছে যে, আধুনিক উপন্যাস লেখকেরা বঙ্কিম-সাহিত্যকে ডুবাইয়া দিল। বঙ্কিম-সাহিত্য ডুবিবার নয়। সুতরাং আশংকা তাহাদের বৃথা। কিন্তু আধুনিক ঔপন্যাসিকদের বিরুদ্ধে এই যে নালিশ যে, ইহারা বঙ্কিমের ভাষা, ভাব, ধরন ধারণ, চরিত্র-সৃষ্টি কিছুই আর অনুসরণ করিতেছে না, অতএব অপরাধ ইহাদের অমার্জনীয়, ইহার জবাব দেওয়া একটা প্রয়োজন।' আদালতের বিচার কি হবে কে জানে কিন্তু কোনো বিষয়ে নালিশ জানাতে শরৎচন্দ্রকে অগ্রণী দেখা যায় বার বার। সেখানেই বোধ হয় তাঁর দরদী হৃদয়েরও পরিচয়। সাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি আছে বলেই তিনি জবাব দিলেন এইভাবে—'বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা আমাদের কাহারও অপেক্ষা কম নয়, এবং সেই শ্রদ্ধার জোরেই আমরা তাঁহার ভাষা, ভাব পরিত্যাগ করিয়া আগে চলিতে দ্বিধা বোধ করি নাই। মিথ্যা ভক্তির মোহে আমরা যদি তাঁহার সেই ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার বস্তুই শুধু ধরিয়া পড়িয়া থাকিতাম, ত কেবলমাত্র গতির অভাবেই বাঙ্গালা সাহিত্য আজ মরিত। দেশের কল্যাণে একদিন তিনি নিজে প্রচলিত ভাষা ও পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া পা বাড়াইতে ইতস্ততঃ করেন নাই, তাহার সেই নির্ভীক কর্তব্য-বোধের দৃষ্টান্তকেই আজ যদি আমরা তাঁহার প্রবর্তিত সাহিত্য সৃষ্টির চেয়েও বড় করিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি, ত সে তাঁহার মর্যাদা হানি করা নয়। এবং সত্যই যদি তাঁহার ভাষা ধরন-ধারণ, চরিত্র-সৃষ্টি প্রভৃতি সমস্তই আমরা আজ ত্যাগ করিয়া গিয়া থাকি ত দুঃখ করিবারও কিছু নাই।' বঙ্কিম-প্রভাব মুক্তির বিষয়ে শরৎচন্দ্রের নিজেরই এই অকপট স্বীকারোক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি 'প্রবৃত্তিকে বুদ্ধির বাটখারায় ওজন করিয়া সাহিত্যের মূল্য নির্দেশ করিতে' কখনও চান নি। তাঁর কাছে সাহিত্য একটা নিজক স্রষ্টার অনুভূতি এবং অনুভাবনা। সহজ গতির স্বচ্ছন্দ বিকাশ। এই প্রবন্ধের উপসংহারটি তাই উল্লেখযোগ্য যেখানে বলছেন—'ভালো-মন্দ সংসারে চিরদিনই আছে। হয়ত চিরদিনই থাকিবে। ভালোকে ভালো, মন্দকে মন্দ সে-ও বলে, মন্দের ওকালতি করিতে কোনো সাহিত্যিকই কোনো দিন সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয় না, কিন্তু ভুলাইয়া নীতিশিক্ষা দেওয়াও সে আপনার কর্তব্য বলিয়া জ্ঞান করে

না। দুর্নীতিও সে প্রচার করে না।' তবে সে কি করে? শরৎচন্দ্র বললেন —'একটুখানি তলাইয়া দেখিলে তাহার সমস্ত সাহিত্যিক-দুর্নীতির মূলে হয়ত এই একটা চেষ্টাই ধরা পড়িবে যে, সে মানুষকে মানুষ বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতে চায়।'

সাহিত্যের মৌলচিন্তায় শরৎচন্দ্র স্বল্প কিছু প্রবন্ধে যে ভাব ও ভাবনা ব্যক্ত করেছেন তার সামান্য অংশেই এক অসামান্য দীপ্তি আমরা উপলব্ধি করি। তিনি ১৩৩০ সালের জ্যৈষ্ঠে বরিশাল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ শাখার অভিনন্দনের উত্তরে প্রদত্ত ভাষণটিতে 'ভবিষ্যৎ বঙ্গ সাহিত্য' বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেছিলেন—'সমাজের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে তার ভিতরের বাসনা কামনার আভাস দেওয়াই সাহিত্য। ভাবে, কাজে, চিন্তায় মুক্তি এনে দেওয়াই ত সাহিত্যের কাজ। সাহিত্য যদি বাস্তবিক মুক্তির ব্যাপার হয়, তবে আমাদের সাহিত্য একেবারেই পঙ্গু। আমাদের সাহিত্যে নতুন জিনিস দেবার যো নেই।' শরৎচন্দ্র কথাটা বলছেন বেশ একটা মনের ক্ষোভ নিয়েই যেন। নতুনের অভিযান, কালের পদধ্বনি সব দেশে এসে গিয়েছে অথচ বঙ্গ সাহিত্যে আসলেই দোষ, এটা যেন মানতে চাইলেন না। প্রাচীনপন্থী সমালোচকের দল এ সব বরদাস্ত করতে চান না। তাঁরা চিরাচরিত ধারায় ও সনাতন চিন্তায় অভ্যস্ত। তাঁরা নবীনবরণের উদার মানসিকতার উত্তরাধিকারী ছিলেন না। তাঁরা শুধুই মহান বিগতের বিধৃতিই জানতেন। নবীনের আলোয় যে আগামীকালের আলোকিত অধ্যায় রচনা হয় তা বিস্মৃত হয়েছিলেন। 'ইউরোপের কথা ধরুন। ওদের 'চার্চ' আছে, 'নেভি' আছে, 'আর্মি' আছে। ওদের অবাধ মেলামেশা আছে, আনন্দ আছে। আমাদের এদিক যাবার জো নেই, ওদিক যাবার জো নেই, কোনো দিকে একটু নড়চড় হয়েছে কি সব গোলমাল হয়ে যাবে! তারই মধ্যে যে একটু-আধটু পারে সে আমাদের নিত্যকার বৈচিত্র্যহীন সংসার ও সমাজের কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করে।' অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের সীমানা সীমিত এবং সমাজজীবনকে তার যথার্থ রূপদানও দুরূহ। অথচ লেখকের স্বাধীনতা যদি স্বীকৃত হয় তা হলে সোনা ফলতে পারে। শরৎচন্দ্র তা দেখালেন। তাই এ কথা তিনিই বলতে পারলেন—'সাহিত্যে স্বাধীনতার মানে অরাজকতা, 'এনার্কি' নয়। এখানে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করে কারুর মনে ভয় জাগিয়ে তুলতে আমি চাইনে, কিন্তু দেখি কথা হয় যেন সব লুকিয়ে লুকিয়ে, ভয়ে ভয়ে। 'সিডিশন' বাঁচিয়ে এখানে মুক্তির কথা বলা হয়।

তাই আমার মনে হয়, বড় সাহিত্যিক আমাদের দেশে এখন আর জন্মাবে না।' ভীষণ আক্ষেপের সঙ্গে উচ্চারণ করলেন। এবং তার পরই আবার অবশ্য শরৎচন্দ্র তাই উদাত্ত কণ্ঠে বললেন—'রাজনীতিতে, ধর্মে,সামাজিক আচার ব্যবহারে যেদিন আমাদের হাত-বাঁধা, পা-গুটানো আর থাকবে না, যে দিন আনন্দের ভিতর দিয়ে লিখতে পারা যাবে, সেই দিন আবার সাহিত্যসৃষ্টির দিন ফিরে আসবে।'

এবং শরৎচন্দ্র চাইলেন বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে সমপর্যায়ে বঙ্গসাহিত্যকে সমান সমান সম্মানের আসন পেতে বসাতে। তিনি 'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি' বিষয়ের আলোচনায় তাই তাঁর একটু উচ্চকণ্ঠেই যেন বলে উঠেছিলেন—'বরঞ্চ এই অভিসপ্ত, অশেষ দুঃখের দেশে, নিজের অভিমান বিসর্জন দিয়ে রুষসাহিত্যের মতো যে দিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ, দুঃখ, বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সে দিন এই সাহিত্যসাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্বসাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে।'

শরৎচন্দ্র সমালোচনার নামে অনাচারটা বরদাস্ত করতে পারতেন না। তিনি দেখেছেন ভালো লেখাকে খারাপ বলে সমালোচনা হতে আবার খারাপ লেখাকে ভালো বলে সমালোচিত হতে। তাই 'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি' প্রবন্ধেই বললেন—'সংসারে রাবিশ বই-ই কেবল একমাত্র রাবিশ নয়, সমালোচনার ছলে দায়িত্ববিহীন কটুক্তির রাবিশেও বাণীর মন্দিরপথ একেবারে সমাচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারে।' এবং শরৎচন্দ্র এই প্রসঙ্গের নানাবিধ আলোচনার পর একটা চমক লাগানোর মতো অভিমত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—'সাহিত্য জাতীয় ঐশ্বর্য, ঐশ্বর্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত। বর্তমানের দৈনন্দিন প্রয়োজনে তাকে যে ভাঙিয়ে খাওয়া চলে না, এ কথা কোনো মতেই ভোলা উচিত নয়।' সতীত্বের এবং নারীত্বের চিরন্তন প্রশ্ন নিয়ে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের যে স্বরূপ-ধর্ম তারও কথা তিনি বললেন এই রচনায়। তিনি বললেন—'পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড়'। তিনি তো সাহিত্যধর্ম নিয়ে মৌল ভাবে আলোচনা যা করলেন তাতে ভাবের ও ভাবনার উভয়বিধ রূপই প্রকাশিত দেখা যায়। একদিকে তিনি সাহিত্যের ভাববস্তুর কথা বলেছেন আরেক দিকে ভাবনার কথাও বলেছেন। তিনি সহজ ভাবেই বললেন—'শুধু একটা কথা বলে রাখতে চাই যে, আনন্দ ও সৌন্দর্য কেবল বাহিরের বস্তুই নয়। শুধু সৃষ্টি করবার ত্রুটিই আছে, তাকে গ্রহণ করবার অক্ষমতা নাই,

এ কথা কোনো মতেই সত্য নয়। আজ একে হয়ত অসুন্দর আনন্দহীন মনে হতে পারে; কিন্তু ইহাই যে এর শেষ কথা নয়, আধুনিক-সাহিত্য সম্বন্ধে এ সত্য মনে রাখা প্রয়োজন।'

বঙ্কিম-শরৎ সমিতি প্রদত্ত ৫৫তম জন্মদিনের অভিনন্দনে শরৎচন্দ্র যে অভিভাষণটি প্রদান করেন তাতে তিনি স্পষ্টই বললেন 'সাহিত্য-রচনায় আর যাই কেন না হোক, শ্লীলতা, শোভনতা, ভদ্ররুচি ও মার্জিত মনের রসোপলব্ধিকে অকারণ দাম্ভিকতায় বারংবার আঘাত করতে থাকলে বাংলা সাহিত্যের যত ক্ষতিই হউক, তাঁদের নিজেদের ক্ষতি হবে তার চেয়েও অনেক বেশি।' শরৎচন্দ্র উদার মন ও স্বচ্ছ দৃষ্টিতে সাহিত্যের যথার্থ রসজ্ঞ। তিনি আধুনিক-সাহিত্যকে বরণ করার মন নিয়েই ছিলেন এবং সেই মানসিকতাকেই বরণীয় ভেবেছিলেন।

শরৎচন্দ্র নিজের বিষয়ে অনেক জায়গায় অনেক কথা লিখেছেন, তার মধ্যে 'বিজলী'র ষষ্ঠ বর্ষের ত্রয়োদশ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি পত্রে যা লিখলেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বললেন—'বইয়ের মধ্যে আমার মানুষের দুঃখ-বেদনার বিবরণ আছে, সমস্যাও হয়ত আছে, কিন্তু সমাধান নেই। ও কাজ অপরের, আমি শুধু গল্প লেখক, তা ছাড়া আর কিছুই নই।'

কিন্তু শিল্প সৃষ্টি হয়েছে এমন নিপুণ তুলিতে যে শরৎচন্দ্র তাঁর বক্তব্যকে সার্থকভাবে রসিকের সহৃদয় রাজ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে অনুরণন তুলেছেন। 'পথের দাবী' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তিই যেন সমগ্র শরৎ-সাহিত্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথের উক্তিরই প্রতিধ্বনি করে বলতে পারা যায়—'এ বই প্রবন্ধের আকারে লিখিলে মূল্য ইহার সামান্যই থাকিত, কিন্তু গল্পের মধ্যে দিয়া যাহা বলিয়াছ দেশে ও কালে ইহার ব্যাপ্তির বিরাম রহিবে না।'

[ভ্রম সংশোধন। এই প্রবন্ধের তৃতীয়-চতুর্থ পৃষ্ঠায়—'শরৎচন্দ্র 'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি' প্রবন্ধটি লেখেন ১৩৩১ সালের চৈত্র মাসে মুন্সীগঞ্জের সাহিত্যসভায় সভাপতির অভিভাষণরূপে'—এইভাবে পড়তে হবে]

সুভাষ-মানস স্বদেশ ও সাহিত্য

১

স্বদেশ ও সভ্যতার শাশ্বতের মধ্যেও বিবর্তিত ধারায় বিকশিত সুভাষ-মানসের যথার্থ রূপরেখা।

'নূতনের সন্ধান'য়েই 'তরুণের স্বপ্ন' নিয়ে দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর জীবন-মননের দুটি সত্তা। এই দুই সত্তার দুই প্রতিকৃতিই আমাদের চোখে ভাসে। একটি আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক রূপে বা নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর পরিচালক রূপে এবং অপরটি যৌবনদীপ্ত তরুণেরই স্বপ্নময় বাঙালী প্রতিভূ রূপে কলকাতার পৌর-প্রধান বা ভারতের কংগ্রেস-সভাপতি। সুভাষচন্দ্রের কর্মময় বৈচিত্র্যবহুল জীবনদর্শনের আলোচনায় এই উভয়বিধ সত্তাই সত্য ও স্বীকার্য। তিনি একদিকে মহাভারতের মহানায়ক শ্রীকৃষ্ণের মতো পৌরুষদীপ্ত কণ্ঠে ক্ষাত্রবীর্যের বাণীবীজ ছড়িয়েছেন, আজাদ হিন্দ ফৌজের সমর প্রাঙ্গণে পাঞ্চজন্য শঙ্খই প্রতি-ধ্বনিত করেছেন। তাঁকে নেতাজী অভিধায় ভূষিত করে বরণীয় করা হয়েছে। সুভাষচন্দ্রের সে সময়ের বাণী-উচ্চারিত যেন পরাধীন ভারতবাসীর কাছে গীতা স্বরূপে। তিনি বলছেন অত্যন্ত ধৈর্য ও সাহসের সঙ্গে, অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও ব্যক্তিত্বে স্থিতধী হয়ে। কিন্তু উদাত্ত আহ্বান ভারতবাসীর কাছে, স্বামী বিবেকানন্দের যথার্থ শিষ্যের মতোই—ওঠো জাগো, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'। ভারতের পূর্বপ্রান্তের ভূখণ্ডে জাতীয় পতাকা উড্ডীন করে বললেন—'চলো দিল্লী পুকারকে।'—'কদম কদম বাড়ায়ে যা…'। অপরদিকে সুভাষচন্দ্রের গভীর জীবনদর্শনের মধ্যে তলিয়ে গেলে শুনতে পাব মোহন-মুরলী। সমন্বয় আর সামঞ্জস্য বিধানের বিচিত্রবিস্তার। তিনি ভারতমাতার মৃত্তিকাকে ললাটে তিলক করে জীবনের সমাজের ও রাষ্ট্রের যথার্থ যে সমস্যা তার মধ্যে কল্যাণ শিখাকে আবিষ্কার করতে চাইলেন। বললেন—'এই দুঃখদগ্ধ, বেদনাপূর্ণ নরলোকে আমরা আনন্দ-সাগরের বাণ ডাকিয়া আনিব।' সুভাষচন্দ্রের এই বার্তা 'তরুণের স্বপ্নে' ঝলমল করছে।

সুভাষচন্দ্রের জীবনের এমন এক একটা দিক আছে যা আমাদের গভীরভাবে

তাবার কারণ তিনি এমন একটা মানসিকতার পুরুষ যে আমাদের আশ্বাস হয় যাঁর কোনো গোষ্ঠীগত বা আচারগত চিন্তার বন্ধির না পাওয়াটাই অবশ্য স্বাভাবিক। অথচ তাঁর মাকে লেখা চিঠিতে দেখা যাচ্ছে কি সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে তিনি বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে নিজেকে বিস্তৃত করেছিলেন। কটক থেকে এক শনিবারে পুজোর নবমীর দিন মাকে লিখেছিলেন—'যে পূজায় আমরা ভক্তি-চন্দন ও প্রেম-পুষ্প ব্যবহার করিতে পারি তাহাই জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পূজা। জাঁকজমকের সম্মুখে ভক্তি পলায়ন করে। এবার একটা দুঃখ রহিয়া গেল। সেটা বড় বেশি দুঃখ—সাধারণ দুঃখ নহে।' এই দুঃখটা তাঁর কি, তা তিনি কি সুন্দর করেই না বর্ণনা করে লিখেছিলেন—'এবার দেশে যাইয়া সেই ত্রৈলোক্যপূজ্যা সর্বদুঃখহারিণী, মহিষাসুরমর্দিনী জগন্মাতা দুর্গাদেবীর সর্বা-ভরণভূষিতা নানা সাজসজ্জিতা, দেদীপ্যমানা জ্যোতির্ময়ী মূর্তি দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক করিতে পারিলাম না; এবার পুরোহিত মহাশয়ের সেই মধুর, পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ বা তাঁহার শঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনি কর্ণগোচর করিয়া শ্রবণশক্তি চরিতার্থ করিতে পারিলাম না, এবার কুসুম চন্দন ও ধূপাদির পবিত্র গন্ধের দ্বারা নাসিকাদ্বয়কে পবিত্র করিতে পারিলাম না; এবার একত্র বসিয়া দেবীর প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া রসনেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করিতে পারিলাম না, এবার পুরোহিত-প্রদত্ত কুসুমরাশির দ্বারা স্পর্শেন্দ্রিয়কে ধন্য করিতে পারিলাম না এবং সর্বোপরি "শান্তি জলের" অভাবে শান্তি লাভ করিতে পারিলাম না,'—এই পর্যন্ত লিখেই শেষ করলেন না, আবেগভরে লিখেছিলেন—'সবই নিষ্ফল হইল; পঞ্চেন্দ্রিয় নিষ্ফল হইল।' সুভাষ-মানসে কিন্তু সার্বজনীন এই মহাশক্তির প্রতি দৃষ্টিদীপ্তি চমক লাগানোই বলা যায়। এই পত্রেই পরে লিখেছিলেন—'কিন্তু যদি দেবীর সর্বত্র বিরাজমানা অম্বরব্যাপিনী মূর্তি দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে মা, সে দুঃখ ঘুচিত—কাষ্ঠপুত্তলিকা দেখিবার ইচ্ছা হইত না; কিন্তু সে আনন্দ, সেইরূপ সৌভাগ্য কয়জনের কপালে ঘটিয়া থাকে। কাজে কাজেই আমার এই দুঃখ রহিয়া গেল।' এখানে নিজের মনকে মেলে ধরেছেন যেন।

যাঁকে সুভাষচন্দ্র তাঁর স্কুল জীবনেই এমন সব চিঠি লিখেছিলেন। তিনি আবার এক চিঠিতে লিখলেন—'শ্রীশ্রীগুরুদেব এবং মাতাঠাকুরাণী কেমন আছেন লিখিবেন। তাঁহাদিগকে আমার ভক্তিপ্রণাম জানাইবেন। তাঁহাদিগকে আমি প্রত্যহ স্মরণ করি। তিনি এখানে যে পুষ্প চয়ন করিয়া রাখিতেন এবং আমরা মিলা তাঁহার সুগন্ধ ঘ্রাণ করিতাম তাহা এখনও যেন দেখিতে পাই। 'তিনি

যেদিন পূজা করিয়া 'শান্তিজল' ও পুষ্প বিতরণ করিয়াছিলেন তাহা এখন যেন মানস-চক্ষে দেখিতে পাই।' এমনি উচ্ছ্বসিত হয়ে লেখার পরই সুভাষচন্দ্র সচেতন হয়ে উঠলেন এবং লিখলেন—'আমি বড় পাগলের মত লিখিতেছি।' আর একটি চিঠিতে দেখা যাচ্ছে মাকে বলছেন—'বসুমতীর আপিসে শঙ্করাচার্য্যের সমুদয় স্তোত্র খুব সস্তায় বিক্রয় হইতেছে।...পুস্তকটি আপনার নিকট রাখিবেন এবং কটকে আসিবার সময় লইয়া আসিবেন।' ছাত্রজীবনের প্রাথমিক স্তরেই তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন। আবার এই চিঠিতেই আরেক মানসিকতা ফুটেছে। লিখেছেন—'আমি নিরামিষাশী হইতে চাই কারণ "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" এ কথা আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন। কেবল শাস্ত্রকারেরা বলেন নাই—স্বয়ং ঈশ্বর এ কথা বলিয়াছেন। আমাদের কি অধিকার আছে যে আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টি নষ্ট করিব?' এবং তিনি যুক্তি দিয়ে বলছেন—'যাহারা বলেন যে মৎস্য না খাইলে চক্ষু ক্ষীণদৃষ্টি হয় তাঁহারা ভুল বুঝিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্রকারেরা এরূপ মূর্খ নন যে লোককে দৃষ্টিহীন করিবার জন্য তাঁহারা মৎস্য খাওয়া বারণ করিবেন।' আর শেষ করেছেন এই বলে যে—'আপনাদের বিনা অনুমতিতে আমার কিছু করিতে প্রবৃত্তি হয় না।' চিঠিতে লিখেছেন—'নদাদা আমার পাতে জোর করিয়া মাংস দিলেন। কি করি! অগত্যা খাইলাম কিন্তু বড় অনিচ্ছায়।' এখানে একদিকে অনীহা অপরদিকে নৈতিকতা।

স্কুল জীবনের স্মৃতির মধ্যেও তিনি এই বিষয়েও আলোকপাত করেছেন। তিনি লিখছেন—'আমাদের বাড়িতে আবার নিরামিষের চাইতে আমিষটাই বেশি চলত।' তিনি লিখেছেন এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর প্রথম উপদেশ— মাছ মাংস বা ডিম কোনোটাই খাওয়া চলবে না।' তাই লিখেছেন—'কিন্তু শত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও আমি উপদেশ পালন করেছিলাম।' দ্বিতীয় উপদেশ ছিল স্তোত্রপাঠ। দৈনিক তাও পাঠ করেছিলেন কিন্তু তার পরের উপদেশ ছিল বাপমায়ের বাধ্য হওয়া এবং প্রভাতে উঠেই তাঁদের প্রণাম করা—এ দুটিকে অবশ্য তিনি গোলমেলে বলেছেন। তবে যুক্তির পথে ছিল তাঁর মন। বালক বয়সেও সেই দোলায় দোলাচল হয়েছিলেন, তবু প্রণাম করেছিলেন অবশ্যই যদিও তা বেশি দিন স্থায়ী হয় নি।

আরেকটি চিঠিতে কটক থেকেই এক বৃহস্পতিবার লিখছেন—'ভগবানের দয়ার অভাব নাই—দেখিতে বসিলে জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহার দয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে আমরা অন্ধ, অবিশ্বাসী, ঘোর নাস্তিক, তাই তাঁহার দয়ার

ব্যাখ্যা বুঝিতে পারি না। আর বুঝিব বা কি করিয়া?' কারণ স্বরূপ বলছেন—'দুঃখে পড়িলে তাহাকে ডাকি—অনেকটা প্রাণ খুলিয়া ডাকি—কিন্তু যেই দুঃখ দূর হইল—যেই সুখের আলোক আসিতে লাগিল—অমনি আমাদের ডাকা বন্ধ হইল আর আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া গেলাম।' এখানে তাঁর বক্তব্যকে এক উদাহরণের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিতও করছেন এই বলে—'এই জন্যই ত কুন্তিদেবী বলিয়াছিলেন, "হে ভগবান! আমাকে সর্ব্বদা বিপদের মধ্যে রাখিও, তাহা হইলে আমি তোমায় সর্ব্বদা প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে পারিব; সুখের সময় তোমাকে ভুলিয়া যাইতে পারি—অতএব আমার সুখে প্রয়োজন নাই।"

সুভাষচন্দ্র এই বোধটিকে ধ্রুবজ্ঞানেই গ্রহণ করেছিলেন তা তাঁর সমগ্র জীবনটিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। ত্যাগের জীবন ত্যাগীর সাধনা—স্বদেশ মন্ত্রে দীক্ষিত পুরুষ। স্কুল জীবনের স্মৃতিচারণায় তাই প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাস প্রসঙ্গে লিখলেন—'তিনি আমার মনে মোটামুটি একটা নৈতিক মূল্যবোধ জাগিয়ে দিয়ে গেলেন—বুঝতে শিখলাম জীবনে নৈতিক আদর্শটাই সবচেয়ে বড় জিনিস। পাঠ্য বইয়ে পড়েছিলাম—

পদমর্যাদা—মোহরের পিঠে ছাপ তো শুধু,
আসল সোনা সে আর কেউ নয়, মানুষ নিজে।

এর মর্ম তিনিই আমায় বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। এতে আমার চরিত্রগঠনে কতখানি যে সাহায্য হয়েছিল বলবার নয়—কারণ তখন আমার মধ্যে যৌন-চেতনার প্রথম উন্মেষ দেখা দিয়েছে—বয়ঃসন্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেটা স্বাভাবিকভাবে সকলের মধ্যেই আসে!' মানসিক এমন একটা সময়েই তিনি মাকে লিখছেন আবার—'জন্মমৃত্যু লইয়া এ জীবন—তাহাতে একমাত্র সার জিনিস—হরিনাম। তাহা না করিতে পারিলে জীবন নিরর্থক। আমাতে পশুতে প্রভেদ এই যে পশুরা ভগবানকে বুঝিতে বা বুঝিয়া ডাকিতে পারে না আর আমরা চেষ্টা করিলে তাহা পারি। তবে এ ভবে আসিয়া যদি ভগবানের নাম না করিতে পারিলাম তবে এখানে আসা আমার বিফল হইল।' স্পষ্টভাষায় মনের এই ভাব ছাত্র জীবনেই বলেছেন। বলেছিলেন—'জ্ঞান বড়, বড় জিনিস—ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা ধরিবে না—তাই ভক্তি চাই, জ্ঞান এখন চাহি না। তর্ক করিতে চাই না—কারণ আমি অজ্ঞ এবং অন্ধ। সুতরাং এখন চাই কেবল বিশ্বাস—অন্ধ বিশ্বাস—শুধু "হরি আছেন" এই বিশ্বাস; আর কিছু চাহি না। ভক্তি বিশ্বাস হইতে আসিবে

এবং জ্ঞান ভক্তি হইতে আসিবে। মহর্ষিগণ বলিয়াছেন "ভক্তির্জ্ঞানায় কল্পতে" —ভক্তি জ্ঞানের জন্য ধাবিত হয়।' একেবারে ক্ষীরটুকু তুলে নিয়ে কি করে স্কুলের ছাত্র লিখলেন ভাবাই যায় না। ভক্তি ও জ্ঞানের তত্ত্বকথা সরল-সহজ করে বলেছেন। পাঠ ও উপলব্ধি যে কতটা মনকে আলোড়িত করেছে এখানেই তার প্রকাশ। তিনি লিখছেন —'লেখাপড়ার উদ্দেশ্য বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জ্জিত করা এবং সদসৎ বিবেচনাশক্তি দেওয়া।' একটি সমাজচিত্রই তুলে ধরে আরো খুলেই বলেছেন —'লেখাপড়া শিখিয়াও যদি কেহ হীনচরিত হয় তবে তাহাকে কি পণ্ডিত বলিব ? কখনই না।' এ কথা লেখার পরই লিখছেন —'মূর্খ হইয়াও বিবেকাধীন'কেই মহাপণ্ডিত বলবেন।

এই সময় যে বৈষ্ণবদর্শনের প্রভাবে সুভাষ-মানস চঞ্চলিত, তাই বেশ স্পষ্টা-স্পষ্টিই লিখছেন মাকে—'বৈষ্ণবধর্ম্মের লোপ হইবার উপক্রম হইলে, বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ অদ্বৈতাচার্য্য বৈষ্ণবধর্ম্মের অবমাননায় ব্যথিত হইয়া প্রার্থনা করেন, ' হে ভগবান রক্ষা কর, এ কলিযুগে আর ধর্ম্ম থাকে না, তুমি আসিয়া উদ্ধার কর।" তখন নারায়ণ চৈতন্যদেবের দেহ ধারণ করিয়া পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন করেন। এইসব দেখিয়া পাপের অন্ধকারের ভিতরেও মাঝে ২ সত্য, জ্ঞান, প্রেম ও ধর্ম্মের আলোক দেখিতে পাইয়া আশা হয় যে এখনও আমাদের উন্নতি হইতে পারে, তাহা না হইলে কেন তিনি পুনঃ পুনঃ এখানে আসিয়া মানবদেহ ধারণ করিবেন।' তাঁর মনের মধ্যে গভীর বিশ্বাস তখনই দেখা যাচ্ছে গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের জ্ঞান-কর্ম-সন্ন্যাস যোগের প্রাক-কথনে। সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকে যেখানে বলা হয়েছে—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥৭
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৮

'যতদিন স্কুলে ছিলাম অন্যান্য ব্যাপারে অকালপক্ব হলেও রাজনৈতিক জ্ঞান আমার সামান্যই ছিল।' আত্মজীবনীতে সুভাষচন্দ্র এমনি ভাব ব্যক্ত করেছেন তাই মনে হয় পারিবারিক প্রভাবে তাঁকে নৈতিক চেতনার উদ্ভব হতেই প্রথম সহায়তা করে। তাই অল্পেই মাকে এক রবিবারে কটক থেকে লিখতে পেরে-ছিলেন—'আমার হৃদয় কাননে সময়ে ২ যে ভাবকুসুম প্রস্ফুটিত হয় তাহার সহিত চোখের অশ্রুজল মিশাইয়া আপনার চরণকমলে উপহার দিই। কিন্তু

সে কুসুমের গন্ধে আপনার হৃদয়ে আনন্দের উদ্রেক হয়, না তাহার তীব্রতায় আপনাকে নাসিকা কুঞ্চিত করিতে হয়, তাহা না জানিতে পারায় আমি কতকটা অশান্ত হইয়াছি।' মাকে চিঠি লেখায় যে তিনি কত আগ্রহী ছিলেন তা তাঁর রাঁচি থেকে আরেক রবিবারে লেখা চিঠিতেও বেশ বলেছেন—'আমার এক অভ্যাস পত্র লিখিতে বসিলে সংযম রাখি না—তাহাতে হৃদয় ঢালিয়া দিই।' এর সুন্দর উদাহরণ রয়েছে ঠিক পূর্বের পত্রটিতেই তিনি যেন কবি কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের রূপকটি মনে রেখে লিখলেন—'আমার হৃদয়ে সময়ে ২ অকালীন মেঘের ন্যায় যে ভাব উদয় হয় তাহা নিকটে কাহাকে বলিব তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া দূরদেশে আপনার নিকট প্রেরণ করি। আপনি কিরূপভাবে তাহা গ্রহণ করেন তাহা জানিলে বড় আনন্দিত হই।' কিন্তু এই চিঠিতেই ভগবান ভজনার কথা যেমন বলেছেন তেমনি মনুষ্যত্বের কথাও বলতে পেরেছেন সেই বয়সেই এটাই বড় আশ্চর্য করে। তিনি যেমন উদ্ধৃতি দিয়েছেন—'ভজগোবিন্দং, ভজগোবিন্দং, ভজগোবিন্দং মূঢ়মতে।' তেমনি লিখছেন—'ভগবান কলিযুগে একটি নূতন সৃষ্টি করিয়াছেন—যাহা অন্য কোনোও যুগে ছিল না। সেই নূতন সৃষ্টি—'বাবু'-সৃষ্টি। আমরাই সেই "বাবু" সম্প্রদায়ভুক্ত।' তাই তিনি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধেরই মতো যেন লিখলেন—'আমরা শারীরিক পরিশ্রমকে "ছোটলোকের কাজ" বলিয়া ঘৃণা করি কারণ আমরা "বাবুলোক"।' এবং বাবু বিষয়ে শেষ মন্তব্যে লিখেছেন—'আমরা মনুষ্যত্বহীন, মনুষ্যরূপধারী পশু।' চিঠির শেষ প্রতিবেদনটি বেদনার সঙ্গেই সেদিন তিনি ব্যক্ত করেছিলেন মায়ের কাছে—'বাঙালী কবে মানুষ হইবে'? কারণ তিনি বুঝেছিলেন—'বাঙালীরা আজকাল হইয়াছে বিলাসিতা-প্রিয়—পরচর্চাকারী, কুটিলহৃদয়, পরমুখাপেক্ষী এবং মনুষ্যত্ববিহীন'। তিনি 'বঙ্গসন্তানকে নূতনভাবে প্রস্তুত' দেখতে চাইলেন তখনই।

কটক থেকে ১৯১৫ সালের এপ্রিলে একপত্রে তাঁর সতীর্থ প্রমথনাথ সরকারকে লিখছেন—বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য, শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, তিনজন ভারতীয় ধর্মসংস্কারক ও রামমোহন রায়ের ছবি বুক পোস্টে পাঠাতে। তাঁর মন যে মহৎ সান্নিধ্য চাইছে তা এখানে বোঝা যাচ্ছে। তিনি এই পত্রে বড় সুন্দর কথা বলেছেন—'যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইলে কোন দোষ নাই। তার পর বাহিরের কথা কাজে পরিণত না করিতে পারিলে যেমন দোষের, ভিতরের ইচ্ছা বা মত কাজে পরিণত না করিতে পারিলে তত

ঘোষের। বাহিরের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে যেমন দোষ, ভিতরের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেও ততো দোষ।' ছাত্রজীবনেই এমন যে উপলব্ধি তা তো অভাবনীয়।

সুভাষ-মানসে ছিল নবজাগৃতির যথার্থ ভাবনা। তিনি রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ থেকে শ্রীঅরবিন্দ পর্যন্ত সবারই ঐতিহ্য ও ভাবৈশ্বর্যকে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি সুন্দর করে স্পষ্ট করে সে কথা বলেছেন বহুবার। আত্মজীবনীর তৃতীয় পরিচ্ছেদেই লিখেছিলেন—'ইংরেজরা ভারত দখল করবার পর বাঙলাদেশে যে ক'জন মনীষীর আবির্ভাব হয়েছিল, যে কারণেই হোক তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু।' তিনি লিখছেন—'উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙলাদেশে ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নতুন ধারার সূচনা দেখা দেয়।' তিনি এই জাগৃতির বিষয়ে বলছেন—'এই আন্দোলন অনেকটা রেনেসাঁস ও রেফরমেশন এর একটি সমন্বয়ের মতো। একদিকে এই আন্দোলন দেশের স্বকীয় ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার এবং ধর্মের সংস্কারের পক্ষপাতী ছিল এবং অন্যদিকে, অন্যান্য দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতি থেকে ভালো জিনিসটুকু গ্রহণ করতেও কম উৎসুক ছিল না।' তিনি এখানে আরো বললেন—'প্রগতিপন্থী সম্প্রদায় যখন পাশ্চাত্য সভ্যতার সার জিনিসগুলি আহরণ করতে ব্যস্ত তখন অধিকতর গোঁড়া সম্প্রদায়ের লোকেরা হিন্দুসমাজের মহিমা কীর্তন করতে ব্যগ্র হয়ে পড়লেন এবং প্রচার করতে লাগলেন হিন্দুসমাজে সবই অভ্রান্ত। এমন কি তাঁরা এও দাবি করলেন যে পাশ্চাত্য সভ্যতা যেসব নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নিয়ে আজ গর্ব করছে সে সবই ভারতের প্রাচীন মুনিঋষিরা বহুদিন আগেই আবিষ্কার করে গেছেন।' তিনি এরই মধ্যে বিদ্যাসাগরকে এক সমন্বয়ের মতবাদে দেখলেন, তাই লিখছেন—'এই মতের সমর্থকেরা প্রগতিপন্থী ছিলেন, এবং তাঁরা দেশীয় ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয়ের সমর্থন করতেন।' এবং সুভাষচন্দ্র একটি সূত্রেই যেন ভাবধারায় নবজাগৃতিকে গ্রথিত করে লিখেছেন—'ঈশ্বরচন্দ্র যে মানসিক উদারতা ও মানবহিতৈষণার প্রতিভূস্বরূপ ছিলেন ধর্মে ও দর্শনে তার প্রকাশ পেয়েছিল রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও তাঁর সুযোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে। ১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দ মারা গেলে এই আধ্যাত্মিক আন্দোলনের ধারা বহন করবার ভার পড়ল অরবিন্দ ঘোষের উপর।'

সুভাষচন্দ্রের মানসগঠনে প্রাথমিক যে যথার্থ উদ্বোধন তা ঘটে স্বামী বিবেকানন্দের বাণীবিভূতিতে। তাঁর আত্মজীবনীর পৃষ্ঠায় পঞ্চম পরিচ্ছেদে

লিখেছিলেন বেণীমাধব দাসের কথা উল্লেখ করে—'প্রধান শিক্ষক মশাই আমার মধ্যে সৌন্দর্যবোধ, নৈতিকবোধ জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন—জীবনে এক নতুন প্রেরণা এনে দিয়েছিলেন কিন্তু এমন আদর্শের সন্ধান দিতে পারেন নি যা আমার সমগ্র সত্তাকে প্রভাবান্বিত করতে পারে। এই আদর্শের সন্ধান দিলেন বিবেকানন্দ।' সুভাষচন্দ্র লিখছেন যে স্বামীজীর চিঠিপত্র ও বক্তৃতা পড়েই তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। 'মানবজাতির সেবা বলতে বিবেকানন্দ স্বদেশের সেবাও বুঝেছিলেন।' সুভাষ মানসে এ কথাই বোধ হয় বীজাকারে অঙ্কুরিত হয়ে ভবিষ্যৎ জীবনে মহীরুহ হয়।

তাই জন্তেই জীবনকে একটি সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে দেখেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন—'আমাদের মাতৃজাতিকে আমরা যদি শক্তিরূপিণী করিতে চাই তাহা হইলে বাল্য-বিবাহ প্রথা উচ্ছেদ করিতে হইবে, স্ত্রীজাতিকে আজীবন ব্রহ্মচর্য পালনের অধিকার দিতে হইবে; উপযুক্ত স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে; অবরোধ প্রথা দূর করিতে হইবে; বালিকা ও তরুণীদের ব্যায়াম শিক্ষার এবং লাঠি ও ছোরা খেলা শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে—এমন কি স্বাবলম্বী হইবার মতো অর্থকরী শিক্ষাও দিতে হইবে, এবং বিধবাদের পুনর্বিবাহের অনুমতি দিতে হইবে।' তাঁর 'নূতনের সন্ধান' গ্রন্থের প্রথম রচনায় এমনি উক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন—'যে পর্যন্ত আমরা ঘরে ও বাহিরে মাতৃ-জাতিকে সম্মান ও গৌরবের আসনে না বসাইতেছি সে পর্যন্ত এ দেশের নারী-জাতি বীর প্রসবিনী হইতে পারেন না।' তিনি মনুর উক্তিও উদ্ধৃতি দিয়েছেন—'যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে, রমন্তে তত্র দেবতাঃ।' অর্থাৎ 'যেখানে নারী পূজিতা হন তথায় দেবতারা আনন্দলাভ করিয়া থাকেন।' অন্যত্র বলেছেন—'পুরুষ অবরুদ্ধ আপন দেশে, নারী অবরুদ্ধ নিজ নিবাসে।'

গণ্ডিকে খণ্ডন করে সীমাকে অতিক্রম করে বিপুল জীবনদর্শনের অখণ্ড অসীমতায় সুভাষচন্দ্র এখানে যুবশক্তির জীবনীশক্তিকে সন্ধান করতে বলেছেন এক প্রগাঢ় অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে। অনুসন্ধিৎসা যুবজীবনে চরম ও পরম শক্তিতে স্ফুরিত। সুভাষচন্দ্রের তৎকালীন সকল যুব-আন্দোলনে প্রদত্ত ভাষণেই তিনি বলেছেন যুবশক্তিই নূতনের সন্ধানের বাণীমূর্তি। তাই জন্তেই বলছেন—'যেখানে বন্ধন, যেখানে গোঁড়ামি, যেখানে কুসংস্কার, যেখানে সঙ্কীর্ণতা—সেখানেই আমরা কুঠার হস্তে উপস্থিত হই।' সুভাষচন্দ্র তাঁর সুপরিচিত 'তরুণের স্বপ্ন' রচনাতেই বলছেন—'যাহা নূতন, যাহা সরস, যাহা অনাস্বাদিত

—তাহারই উপাসক আমরা। আমরা আনিয়া দিই পুরাতনের মধ্যে নূতনকে, অচলের মধ্যে চঞ্চলকে, প্রবীণের মধ্যে নবীনকে এবং বন্ধনের মধ্যে অসীমকে।'

সুভাষ-মানস বুঝতে হলে তাঁর আত্মজীবনীর দশম পরিচ্ছেদটিকে বিশেষভাবেই অনুসরণযোগ্য। এখানে তাঁর দার্শনিক প্রতীতির চমৎকার চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে। তিনি মনে করেছিলেন—'পরম সত্যকে মানুষের মনের দ্বারা আয়ত্ত করা যায়, শঙ্করের মায়াবাদই সমস্ত জ্ঞানের মূল।' এই ভুল ভাঙার পর তিনি বুঝলেন—'এমন ধর্ম চাই যাকে জীবনে পাওয়া যায়।' এই বোধের আলোকে তিনি দেখলেন—'ভারতীয় দর্শনের মধ্যে বহু ধারা আছে যেগুলি জীবনকে সার বলেই জানে, মায়া মানে না।' তিনি দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও রামকৃষ্ণের মতকেই বেশি করে স্বীকার করলেন। এবং সহজে তাঁর মধ্যে 'যত মত তত পথ' উপলব্ধিতে উদ্ভাসিত হয়েছে যে তা বেশ বোঝা যায় যখন পড়ি—'বৈষ্ণবেরা বলেন ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ। শক্তি মতে তিনি শক্তি স্বরূপ; অন্যান্য নানা মতে তিনি জ্ঞান স্বরূপ অথবা আনন্দ স্বরূপ। দীর্ঘকাল ধরে হিন্দু দর্শনে পরমাত্মাকে সচ্চিদানন্দ বলে বর্ণনা করা চলছে।' সুভাষ-মানসের দার্শনিকতার অনেক গভীর বক্তব্যও দেখা দিয়েছে কারণ তাঁর পরিণত জীবনের শিক্ষার একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল দর্শন। তিনি বিলেতে শুধু আই. সি এস পরীক্ষাতেই চতুর্থ স্থান লাভ করে স্থির থাকেন নি, দর্শনের দুটি বিষয়েও কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তাঁর দার্শনিক প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায় যখন পড়ি তিনি বলছেন—'বিশ্ব হচ্ছে আত্মার প্রকাশ এবং আত্মার মতো সৃষ্টিও অমর। সৃষ্টি কোথাও থেমে যেতে পারে না। বৈষ্ণবী নিত্যলীলার ধারণার সঙ্গে এ ধারণার মিল আছে।'

সুভাষ-মানসে যে একটা অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো নিত্য প্রীতি-প্রসারিত অন্তর বর্তমান ছিল তা বোঝা যায় যখন পড়ি তিনি লিখেছিলেন—'মানবজীবনের মূল ভিত্তি হচ্ছে প্রেম। জীবনে প্রেমের এত অভাব যে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হয় তো প্রবল আপত্তি উঠবে। কিন্তু এটা স্ববিরোধী কথা নয়, মূল ভিত্তির এখনো পরিপূর্ণ প্রকাশ হয় নি, স্থানকালের মধ্যে নিত্যই তার প্রকাশ বিস্ফারমাণ। বাস্তবের মূলে প্রেম, বাস্তবের মতোই সে নিত্য পরিবর্তনশীল।' এবং তাই সুভাষচন্দ্র তাঁর লেখা আত্মজীবনীর উপসংহার করেছেন এই বলেই—'সুতরাং চেতনাই বাস্তব, আর চেতনার মূল হচ্ছে প্রেম, যার বিকাশ নিরন্তর চলেছে সংঘাত ও সমাধানের মধ্য দিয়ে।'

এইখানে সুভাষচন্দ্রের একটি প্রচ্ছন্ন রোম্যান্টিকতা-প্রবণ মনজীবনের সন্ধান আমরা পাচ্ছি। সুভাষচন্দ্র চিরকাল আশাবাদী। তিনি কোনোদিন নৈরাশ্যবাদী মানসময়তার পরিচয় দেন নি। তাঁর সব বক্তৃতা, সব বাণী জীবনানুভূতির ক্ষেত্রে আশাবাদীর পরিচায়ক। তাঁর জীবন ও বাণী চিরকাল দুয়েরের অস্পষ্টতার আবরণে রহস্যময়তা থেকে স্পষ্ট প্রত্যক্ষের মধ্যে অনুভূতির স্তরে করেছে আকুতিপূর্ণ। অনির্দেশ্য ভবিষ্যতের বুকে, অজানা পথের বঙ্কিমতাকে উপেক্ষা করে আকাঙ্ক্ষিত আদর্শ ও আশা ফলপ্রসূর জন্যে ভারত সীমান্ত অতিক্রমের প্রচ্ছন্ন-জীবনযাত্রা পরিগ্রহণ করেছিলেন। উত্তমচাঁদের মতো সহায়ক ও সাহচর্যযোগ্য ব্যক্তির সাক্ষাৎ তিনি দেশেবিদেশে লাভ করবেন এ বিশ্বাস তাঁর অন্তরে ছিল। আশাবাদী বলেই তিনি এ পথে পদক্ষেপ করতে পেরেছিলেন। তরুণেরই স্বপ্ন নিয়ে তিনি যে জীবনদর্শনের পরিচয় দিয়েছেন তার মধ্যে আশাবাদের আশা-তীত নিদর্শন পাওয়া যায়। 'অবিশ্বাস ও নৈরাশ্যের পর্বতরাজি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াক অথবা সমবেত মনুষ্য-জাতির প্রতিকূল শক্তি আমাদিগকে আক্রমণ করুক,—আমাদের আনন্দময়ী গতি চিরকাল অক্ষুন্নই থাকিবে।' সুভাষচন্দ্র তাই 'তরুণের স্বপ্ন'য়ে আবার বলছেন—'যৌবনের পূর্ণ জোয়ারে আমরা ভাসিয়া আসিয়াছি সকলকে আনন্দের আস্বাদ দিবার জন্য, কারণ আমরা আনন্দের স্বরূপ। আনন্দের মূর্ত বিগ্রহ রূপে আমরা মর্তে বিচরণ করিব '

রবীন্দ্র-জীবনদর্শনের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের জীবনবাদের যে একটি যোগসূত্র ছিল তা আমরা তাঁর বলার ও লেখার ভাবায় ও ভাবে বেশ বুঝতে পারি। রবীন্দ্র-নাথ 'আনন্দরূপামৃতং যদ্বিভাতি'র যে ব্যাখ্যা করেছেন তারই স্পষ্ট ইঙ্গিত পাই সুভাষচন্দ্রের কথায়। 'তরুণের স্বপ্ন'য়েই তিনি বলছেন—'এই দুঃখ সঙ্কুল, বেদনাপূর্ণ নরলোকে আমরা আনন্দ-সাগরের বাণ ডাকিয়া আনিব। আশা, উৎসাহ, ত্যাগ ও বীর্য লইয়া আমরা আসিয়াছি। আমরা আসিয়াছি সৃষ্টি করিতে, কারণ—সৃষ্টির মধ্যেই আনন্দ।' যেন বলছেন—'আনন্দাদ্ধ্যেবখল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।' আর রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিচিত্র প্রবন্ধে বলেইছেন—'সুখ, ব্যবহার বন্ধনের মধ্যে আপন সৌন্দর্যকে উদারভাবে প্রকাশ করে, এইজন্য সুখ বাহিরের নিয়মে বদ্ধ, আনন্দ সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনার নিয়ম আপনিই সৃষ্টি করে।'

এইখানেই রবীন্দ্র-কবিমানসের সঙ্গে সুভাষ-স্বপ্নমানসের নিবিড় ও মূল যোগ-সূত্র রচিত হয়েছে। অফুরন্ত কর্মের সঙ্গে অপরিমীম আনন্দের প্রাণ প্রবাহের কথাপ্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতার অংশ উদ্ধৃত করেছেন—

'যত দেব প্রাণ বহে যাবে প্রাণ
ফুরাবে না আর প্রাণ ;
এত কথা আছে এত গান আছে
এত প্রাণ আছে মোর ;
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে
প্রাণ হয়ে আছে ভোর।'

প্রাণপুঞ্জে আশাশক্তি নিয়ে যে চলমান জীবন সচঞ্চল তাকে কোনোদিন রবীন্দ্রনাথও যেমন অস্বীকার করতে পারেন নি তেমনি সুভাষচন্দ্রও অস্বীকার করতে পারেন নি। সুভাষচন্দ্র 'গোড়ার কথা' রচনাতেও তাই উদ্ধৃতি দিয়েছেন অতুলপ্রসাদের গানের কলি—

'আমি যাব না, যাব না, যাব না ঘরে
বাহির করেছে পাগল মোরে।'

সুভাষচন্দ্র বসুর ভাষায়—'মনুষ্যজীবন আমাদের নিকট একটা অখণ্ড সত্য।' জীবনে তিনি এ সত্যকে কোনোদিন ভুলতে পারেন নি মনে হয়. তাই 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এ কথারই বিশ্বাসে জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছেন মানুষের স্বাধীনতায়, সকল বন্ধনহীন মুক্তির।

তাঁর জন্মস্থান কটকের বিষয়ে উল্লেখ কালে তিনি আত্মজীবনীর স্মৃতি-চারণায় শুধু রচনা-পারম্পর্য রক্ষা করার জন্যেই মাত্র লেখেন নি, উপরন্তু বলেছেন এবং দেখেছেন জন্মতীর্থপীঠ কটককে এক ঐতিহাসিক সৃজনশীল মন নিয়ে। তিনি বলেছেন—'কলিঙের হিন্দু রাজাদের আমল থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত কটকের ইতিহাস এক অবিচ্ছিন্ন মর্যাদায় দাবি করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে কটকই ছিল উড়িষ্যার রাজধানী এবং পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথদেবের মন্দির, কোণারক, ভুবনেশ্বর এবং উদয়গিরির জগদ্বিখ্যাত শিল্প নিদর্শন কটকেরই দান।' এই বর্ণনা থেকে সুভাষচন্দ্রের মানসজীবনে যে একটি শিল্প রসিক মন লুকিয়ে ছিল, এ কথাও বেশ বোঝা যায়। তিনি আরো বলেছেন—'সব মিলিয়ে এখানকার পরিবেশ শিশুমনের সুস্থ সবল হয়ে গড়ে ওঠার অনুকূলই ছিল। শহরের এবং গ্রাম্যজীবনের—দুয়েরই সুবিধে কটকে পাওয়া যেত।'

ইতিহাস আশ্রিত সুভাষ-মানসের পরিচয় 'তরুণের স্বপ্ন' প্রবন্ধেও পাচ্ছি। সেখানে তিনি দেশের সাধারণের বুদ্ধির ও বাহুর জয় ঘোষণা করেছেন, দেশের বীর্যের ও শৌর্যের বিজয়বার্তা রটনা করেছেন। 'আমরা কি না করিয়াছি,

—ফিনিসিয়া, এসিরিয়া, ব্যাবিলোনিয়া, মিসর, গ্রীস, রোম, তুরস্ক, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, রুশিয়া, চীন, জাপান, হিন্দুস্থান—যে কোনো দেশের ইতিহাস পড়িয়া দেখ—দেখিবে যে ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় আমাদের কীর্তি জলন্ত অক্ষরে লেখা আছে।' তিনি তরুণের মনে ঐতিহ্য প্রীতি এবং প্রাচীন স্মৃতি-রোমন্থনে পুনর্জাগৃতিই চাইছেন। তরুণের প্রসুপ্ত আত্মার পুনর্জাগরণের, তরুণ সম্প্রদায়ের আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বতিকল্পনায় তাঁর মানসজীবনে বহু চিন্তার উদয় হয়েছে। তিনি জীবনের একটা বড় সত্যকে সেদিন পরাধীন ভাবতেই বুঝেছিলেন যে দেশের তরুণ যুবসমাজকে নতুন আশায়, নবীন চেতনায় উদ্বুদ্ধ না করলে সমাজের আমূল পুনর্জাগরণের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হবে। তাই জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তিনি তরুণ সম্প্রদায়কে উপলব্ধি করাতে চাইলেন এবং দেখাতে চাইলেন মনুষ্যত্ব লাভের পথটি কোথায়। 'নূতনের সন্ধান' গ্রন্থে 'ছাত্র আন্দোলন' অংশের প্রথম ভাষণেই লিখেছিলেন—'তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় অসীম শক্তি আছে। সাধনার দ্বারা সে ভস্মরাশি অপনীত হইবে এবং অন্তরের দেবত্ব কোটী সূর্যের উজ্জ্বলতার সহিত প্রকাশিত হইয়া মনুষ্য-সমাজকে মুগ্ধ করিবে।'

সুভাষচন্দ্র ভাষায় ও ভাষণে চেষ্টা করেছিলেন যুবশক্তিকে চিন্তায় ও চরিত্রে দৃঢ় ও আত্ম-সচেতন করতে তাই বারবার স্বামী বিবেকানন্দের মতোই বীরবাণী শুনিয়েছিলেন। বলেছিলেন—'ভারতবর্ষের একটা বিশেষ বাণী আছে এবং জগতকে তাহা শুনাইবার জন্যই ভারতবর্ষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাঁচিয়া আছে। জগতের সাধনা ও সভ্যতার প্রায় প্রতি স্তরেই ভারতবর্ষের একটা নব অবদান দিবার আছে।' নূতনের সন্ধানে ছাত্র আন্দোলনে প্রদত্ত তৃতীয় ভাষণে আরো বলেছিলেন—'একটা তিমির যুগ পার হইয়া ভারতবর্ষের সভ্যতা আজ নবজীবনের পথে চলিয়াছে।'

সুভাষচন্দ্র স্ত্রীপুরুষের সমানাধিকার চিরকাল স্বীকার করে এসেছেন। তিনি দেশে নারীকে পুরুষের শক্তিরূপিণী বলেই দেখেছেন। আমাদের হিন্দু ধর্মের কালী দুর্গা প্রভৃতি সকল শক্তি মূর্তিই নারী, নারী আদ্যাশক্তির অংশ। সুভাষচন্দ্র এ কথা বিশ্বাস করেছিলেন তাই দেশের স্বাধীনতা অর্থাৎ বৈদেশিক দুর্গপ্রাকার বন্ধন থেকে মুক্তির পথে পুরুষের পাশে দাঁড়াতে 'বাংলার মা ও বোনদের প্রতি' আহ্বান জানিয়েছিলেন। সুভাষ-রচনাপ্রকাশ 'নারীজাতি আমাদের সমাজের অর্ধেক'। তাই নেতাজী কি কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক দল

গঠনে, কি আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনে তিনি নারীজাগরণ ও নারীর স্বাধীনতা উভয়কেই সমান দৃষ্টি সহকারে বিচার করেছিলেন।

সমাজ বিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে তিনি নারীর মর্যাদা ও পুরুষ সমাজের কথা ভেবেছেন। 'আমরা কীর্তিত প্রতিপন্ন করি যে "নারী নরকস্য দ্বারং" এবং কামিনীকাঞ্চনের আদর্শ সামনে রেখে আমরা কাঞ্চন ত্যাগ না করতে পেরে তাচ্ছিল্য ভরে তা যেমন লোহার সিন্দুকে বন্ধ করে রাখি, কামিনীকে তদ্রূপ ত্যাগ না করতে পেরে অবজ্ঞা ভরে তাকে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ করে রাখি। ফলে বাংলা দেশের নারীর অবস্থা হয়েছে এই—

সচল হয়েও অচল সে যে বস্তার চেয়েও ভারী
মানুষ হয়েও সঙ্-এর পুতুল, বঙ্গদেশের নারী।'

তিনি 'বাংলার মা ও বোনদের প্রতি' বক্তব্য রাখতে গিয়ে কোনো পুরুষ কবির দু ছত্র কবিতা উদ্ধৃত করে নিজের বক্তব্যের বিষয়বস্তুকে আরো জোরালো করেছেন। উপমা প্রয়োগের শক্তিও যে কতখানি ছিল তা উপরের উদাহরণে হয় তো খানিকটা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর প্রবন্ধে, তাঁর ভাষণে এমনি কত উপমাই না পাওয়া যেতে পারে। লেখাকে পাঠকের মনে ও মনন-ভূমিতে রস সঞ্চার করতে হলে কিছু উপমার প্রয়োজন, বক্তার মনের ভাব শ্রোতার মধ্যে সঞ্চারিত করতে হলেও উপমার প্রয়োজন আছে। সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিও নিরস নয়, সরস ও সজীব।

সুভাষ-মানসের আলোচনায় আমরা দেখতে পাই 'তরুণের স্বপ্ন' বা 'নূতনের সন্ধান' গ্রন্থে মুদ্রিত প্রবন্ধে ও ভাষণের মধ্যে, চিঠিপত্রে ও কথোপকথনে সুভাষচন্দ্রের রসাশ্রিত মনের একটি প্রচ্ছন্ন পরিচয় নিহিত রয়েছে। চিরন্তন তারুণ্যের যে চাঞ্চল্য সুভাষ-মানসে প্রজ্জ্বলিত রয়েছে তার উত্তাপ পাওয়া যায় তাঁর অধিকাংশ রচনায় ও বক্তব্যের ছত্রে ছত্রে। কিন্তু সুভাষ-মানসে তারুণ্য চাঞ্চল্য যৌবনের রাঙারসে অভিষিক্ত হলেও তার মধ্যে একটা অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিকতাবাদের যে জীবনদর্শন তার অভিব্যক্তিও রয়েছে। সুভাষচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীর পঞ্চম পরিচ্ছেদেই বলেছেন—'রামকৃষ্ণের আত্মসংযম ও কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের আদর্শ অনুসরণ করতে গিয়ে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলির সঙ্গে লাগল সংঘাত। আর বিবেকানন্দের আদর্শ মনকে সামাজিক ও পারিবারিক বাধা নিষেধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উদ্বুদ্ধ করল।' সুভাষ-মানসে তাই দেখা যাচ্ছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও

বাণী অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে নিজের মানস-গুরু রূপে কারও কারও কাছে স্বীকার করেছিলেন বলেই শোনা যায়। সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতাবলীতে যে বীর্য-রসের সন্ধান আমরা পাই তা স্বামীজীর গ্রন্থ-বাণী থেকেই আহরিত বলেই বিশ্বাস। আর তাঁর ভাষায় ও ভাষণে যে রুদ্ররস, করুণরস ও রম্যরসের সার্থক সন্ধান পাই তা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যানুরাগী সুভাষ-মানসেরই পরিচয় বহন করছে। সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশেষ ভক্ত ও আগ্রহী পাঠক ছিলেন এ কথা তাঁর শ্রদ্ধেয় কবি ও বন্ধুজন অনেকেই স্বীকার করেছেন। আমরাও তাঁর বিভিন্ন ভাষণে ও নিবন্ধে রবীন্দ্র-কবিতার এবং প্রবন্ধের ভাবাদর্শের স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করেছি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভারততীর্থ' কবিতায় বলেছিলেন—'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে।' এ কথার তাৎপর্য সুভাষ-মানস উপলব্ধি করতে পেরেছিল। তাই তাঁর এ দেশে বা বিদেশে প্রদত্ত ভাষণাবলীর মধ্যে সমন্বয়ী জীবনদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। সুভাষচন্দ্র মনে প্রাণে আশা করতেন সকল দেশের ভালোর সমন্বয়ে ভারতের মহাজাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি পরিপুষ্টি লাভ করুক।

রবীন্দ্রনাথ তাই ১৩৩৯ সালে লিখেছিলেন—'বাঙালি কবি আমি, বাংলা-দেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি।' লিখেছিলেন—'দেশের দুঃখকে তুমি তোমার আপন দুঃখ করেছ, দেশের সার্থক মুক্তি অগ্রসর হয়ে আসছে তোমার চরম পুরস্কার বহন করে।' কবি ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে শান্তিনিকেতনে তাঁর 'তাসের দেশ' গ্রন্থ-উৎসর্গে 'কল্যাণীয় শ্রীমান সুভাষচন্দ্র'কে উদ্দেশ করে তাই লিখেছিলেন—'স্বদেশের চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ করে তোমার নামে 'তাসের দেশ' নাটিকা উৎসর্গ করলুম।' এইখানেই উৎসারিত জননেতার প্রতি জনদরদী কবির যথার্থ আশীর্বাদ ও উৎসাহ প্রদান।

সুভাষচন্দ্র স্বদেশপ্রেমিক রাজনীতিজ্ঞ। কিন্তু এই পরিচয়ের ঊর্ধ্বে তাঁর মানসলোকের উধাও যাত্রা ছিল কল্পলোকের সৌন্দর্যনিকেতনে। আবাল্য তাই নীতিজ্ঞান নীতিজ্ঞান করতে করতেই ভাবজগতের নীলাকাশেও তাঁর পক্ষ-বিস্তার। দেশের সংস্কৃতি, সাহিত্য, ধর্ম, শিল্পকলা, প্রকৃতি—এই সব কিছুকেই উপলব্ধির মাতাও ছিল তাঁর মানসিকতা। সেই জন্যে তাঁর যথার্থ সৃজনশীল প্রাজ্ঞজনের মধ্যেই ছিল অন্তরের আকর্ষণ, ছিল বক্তব্য উপস্থাপনায় সবিশেষ রমণীয়তা।

মননশীল মানসিকতা অথচ স্বদেশ ভাবনাই মৌল।

এ কথা প্রকাশ্যেও বলে দিলে ভালো হয় সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গেই। সুভাষচন্দ্র বসু মূলতঃ দেশনায়ক। সুভাষচন্দ্রের কর্মজীবন দেশসেবা, জনসেবা। বৃটিশ শৃঙ্খলিত আহিমাচল ভারতবর্ষের স্বাধীনতাই তাঁর স্বপ্ন ও বাণী। জীবনে তিনি সর্বপ্রকার বন্ধন হতে মুক্তির কথাই চিন্তা করেছেন—এই মুক্তি মুখ্যতঃ বিদেশী শাসন-নাশনেই। কাজেই সুভাষ-সাহিত্য বলে কিছু আছে কি-না তার বিষয়ে বিচারবিবেচনা করতে হবে এই কথা মনে রেখেই।

সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব বৃটিশ শৃঙ্খলিত ভারতবর্ষের পরাধীনতার তিমিরাচ্ছন্ন তেইশে জানুয়ারীতে। যে ভারতবর্ষ বিদেশীর কারাগৃহ। কিন্তু কারাগৃহেই তো চিরকাল মুক্তিমন্ত্রের উদ্গাতার আবির্ভাব ঘটে থাকে। কংসের কারাগারেই তো মহাভারতের মহানায়ক শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। তেমনি মহাজাতির স্বপ্ন-সাধক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আবির্ভাব বৃটিশের কারাগার পরাধীন ভারতে। ভারতীর বরেণ্য সন্তান সুভাষচন্দ্র। এই যে দাসত্ব লাঞ্ছিত দেশের পটভূমিকায় সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম ও জীবন প্রবাহিত, তারই স্পষ্ট ইঙ্গিত থাকবে তাঁর কর্মে ও জীবনে, ভাষায় ও ভাষণে।

এখানে সুভাষ-সাহিত্যের কথা বলার আগে সাহিত্যিকের প্রথম দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্রের জীবন কেমন প্রতিভাত হয়, সে কথা বলাও অবশ্যই প্রয়োজন। কোনো সাহিত্য-পাঠক সুভাষচন্দ্র বসুর রোমাঞ্চকর এবং কৌতূহলোদ্দীপক জীবনকাহিনীর কথা স্মরণ করলে তাঁর প্রথমেই মনে পড়বে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী'র মহানায়ক সব্যসাচীর কথা। সুভাষ-চন্দ্রের সেই গোপনীয় অন্তর্ধান ও বহির্ভারতে ভারত স্বাধীন করার সুষ্ঠু আয়োজনের কথা ভাবলে সব্যসাচীর বাস্তব রূপ বলেই মনে হবে।

স্বভাবতই এখানে প্রশ্ন জাগে সুভাষচন্দ্র সাহিত্যরসিক ও সাহিত্যপাঠক ছিলেন নিশ্চয়ই। তিনি শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' পড়েছিলেন এবং তাঁর 'সব্যসাচী' চরিত্র পরবর্তী জীবনে জীবনপথের নির্দেশ দান করেছিল—এ কথাও নিঃসংশয়েই বলা চলে। আমরা এখানেই সুভাষচন্দ্রের জীবনপ্রবাহের সঙ্গে সাহিত্যের একটি যোগসূত্রেরও পরিচয় লাভ করছি।

এখানে সুভাষ-সাহিত্য বলতে কি বোঝায় সে কথারই একটুখানি অন্তত আলোচনা করা যাক।

সাহিত্যিক বলতে আমরা যে কথা বুঝি সে হিসেবে ঠিক সুভাষচন্দ্রকে বিচার করলে তো হবে না। সাহিত্যের যে বিরাট পরিধি, সেখানে সুভাষচন্দ্রের সৃষ্টি সামান্যই কিন্তু এই সামান্য সৃষ্টিই যে অনবদ্য, সে কথাটা বলারই এখন বিশেষ প্রয়োজন। তিনি গল্প লেখেন নি, তিনি উপন্যাসও লেখেন নি বা সাহিত্য-আলোচনায় নিবন্ধও লেখেন নি। কোনো কবিতাও তাঁর আমরা পাই নি। আমরা পেয়েছি 'তরুণের স্বপ্ন' গ্রন্থের তিনটি প্রবন্ধ যার মধ্যে প্রথমটিরই নামে গ্রন্থের নামকরণ। অন্য দুটির নাম 'দেশের ডাক' ও 'গোড়ার কথা' এবং আছে ভাষণ ও পত্র। 'বাংলার মা ও বোনেদের প্রতি', 'বাংলার পিতা ও ভ্রাতাদের প্রতি' প্রভৃতি গুটিকতক প্রবন্ধ নিবন্ধ এবং বিভিন্ন সভায় প্রদত্ত ভাষণাবলী ও বিভিন্ন জনকে লেখা পত্রাবলী। এ ছাড়া তাঁর ইংরাজি আত্মজীবনীর বাংলা রূপায়ণ 'ভারত পথিক' নামে একটি জীবনস্মৃতিও আমরা লাভ করেছি। এবং তাঁর ইংরাজি রচনা থেকেই অনূদিত হয়ে প্রকাশিত 'ভারতের-মুক্তি সংগ্রাম ১৯২০--১৯৪২' প্রথম ও দ্বিতীয় এই দুই খণ্ডে প্রকাশ পেয়েছে। 'পত্রাবলী' নামের সংকলনটিও এখানে উল্লেখযোগ্য।

তা হলে দেখা যাচ্ছে সুভাষ-সাহিত্য বিচার করতে হলে বাংলায় প্রকাশিত তাঁর বিভিন্ন পুস্তক পুস্তিকার মধ্যে 'তরুণের স্বপ্ন' 'নূতনের সন্ধান' 'ভারত পথিক' 'বাংলার মা ও বোনদের প্রতি' 'দিল্লী চলো' 'পত্রাবলী' 'ভারতের মুক্তি সংগ্রাম' ইত্যাদি নামে প্রকাশিত গ্রন্থাদির প্রবন্ধ, পত্র ও ভাষণের ওপরই মৌলভাবে আলোচ্য।

'তরুণের স্বপ্ন' গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩৫ সালে। ১০ই পৌষ তারিখে সুভাষচন্দ্র গ্রন্থের 'নিবেদন' অংশটিতে লেখেন—'গত ১৩৩০ সাল হইতে এখন পর্য্যন্ত আমার যে সকল পত্র ও প্রবন্ধ বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, আজ তাহারই কয়েকটি সংগ্রহ করিয়া 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকাশিত হইল।' এবং আশা ও আশ্বাসও দিলেন যে 'সময়ের অল্পতা হেতু সকল পত্র ও প্রবন্ধ এখন প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। এই গ্রন্থখানি জনপ্রিয় হইলে ভবিষ্যতে অন্যান্য বিচ্ছিন্ন পত্র, রচনা ও বক্তৃতা একত্রে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।'

প্রথম প্রবন্ধের নামই 'তরুণের স্বপ্ন'। রচনাকাল ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০। এই প্রবন্ধে সুভাষচন্দ্রের জীবনদর্শনের একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। এখানে সুভাষচন্দ্র সাহিত্যিকের মন নিয়ে অপূর্ব রসাশ্রিত ভাষায় তরুণ সম্প্রদায়কে পুনর্জাগরণের আশার বাণী শুনিয়েছেন। সাহিত্যের মধ্যে যে একটি আশাবাদ

প্রকাশ পায়, সেটির স্পষ্ট পরিচয় 'তরুণের স্বপ্ন'য়ের তিনটি প্রবন্ধেইতো পাওয়া যায়। ১১ই পৌষ ১৩৩২ সালে রচিত 'দেশের ডাক' প্রবন্ধে সুন্দর এক ভাষার ব্যঞ্জনায় তিনি স্বদেশের মুক্তি সাধনায় দেশের তরুণ-তরুণীদের আহ্বান জানিয়েছেন। সুভাষচন্দ্রের আশা—'সাহিত্য বিজ্ঞান সংগীত শিল্পকলা শৌর্য-বীর্য ক্রীড়া নৈপুণ্য দয়াদাক্ষিণ্য—এই সবের ভিতর দিয়ে বাঙালীকে নূতন ভারত সৃষ্টি করতে হবে।'

রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন—

'বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান।'

এরই একটি ভাবান্তরিত রূপ দেখা গেল সুভাষচন্দ্রের কথায় যা 'দেশের ডাক' রচনায় দিয়েছেন—'বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার আকাশ, বাংলার সবুজ শ্যামল ক্ষেত্র ও তালগাছ ঘেরা পুষ্করিণী—এই সবের মধ্যে কি একটা বৈশিষ্ট্য নাই ?' তিনি খাঁটি বাঙালীয়ানার মন নিয়ে বুঝেছিলেন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বাঙালীর পুনর্জাগরণের প্রয়োজনীয়তার কথা। তাঁর ভাষায়—'প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে লালিত পালিত হয়েছে বলেই বাঙালী সুন্দরের উপাসক হয়েছে। সুজলাসুফলা শস্যশ্যামলা জন্মভূমির অন্নজল সেবন করেই বাঙালী কাব্যে ও সাহিত্যে এমন অপূর্ব সৃষ্টিকৌশল দেখাতে পেরেছে।' এই দেশের ছেলেমেয়েদের এই দেশের কাজেই তিনি তাই সুললিত ভাষার হাতছানিতে ডাক দিয়েছেন। বলেছেন—'হে, আমার তরুণ জীবনের দল, তোমরাই ত দেশে দেশে মুক্তির ইতিহাস রচনা করেছ। আজ এই বিশ্বব্যাপী জাগরণের দিনে স্বাধীনতার বাণী যখন চারিদিকে ধ্বনিত হচ্ছে তখন কি তোমরাই ঘুমিয়ে থাকবে ?'

'গোড়ার কথা' প্রবন্ধে আমরা যে সুভাষচন্দ্রকে পাই তিনি স্বদেশহিতৈষী নিছক প্রাবন্ধিক সুভাষচন্দ্র বলেই মনে হবে। প্রকৃষ্টরূপে বন্ধনই যদি প্রবন্ধের সংজ্ঞা হয়, তা হলে 'গোড়ার কথা' একটি খাঁটি প্রবন্ধ। আবার এই প্রবন্ধই রসোত্তীর্ণ হলে তা চিরন্তন সাহিত্যের বস্তু হয়। সুভাষচন্দ্রের রচনার ভাষা সুন্দর প্রাঞ্জল ও স্বচ্ছ। সহজেই পাঠকের হৃদয়তন্ত্রীতে স্পর্শ করে। উপমা সহযোগে স্থানে স্থানে সুন্দর কথার পাশে কথা সংস্থাপনে অপূর্ব রসাশ্রিত সাহিত্যমালায়ই সৃষ্টি করেছেন। এই প্রবন্ধটি পড়তে পড়তে স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের ক'একটি প্রবন্ধ এবং স্বামী বিবেকানন্দের ক'একটি প্রবন্ধের কথা আংশিক স্মরণ হয়। সেগুলোও যেমন সাহিত্যের বস্তু, তেমনি সুভাষচন্দ্রের প্রবন্ধগুলিও

সাহিত্যের বস্তু। তিনি লিখছেন—'নীলকণ্ঠকে আদর্শ করে যে ব্যক্তি বলতে পারে—আমার মধ্যে আনন্দের উৎস খুলে গেছে, তাই আমি সংসারের সকল দুঃখ কষ্ট নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিতে পারি, যে ব্যক্তি বলতে পারে—আমি সব যন্ত্রণা ক্লেশ মাথায় তুলে নিচ্ছি, কারণ এর ভিতর দিয়ে আমি সত্যের সন্ধান পেয়েছি—সেই ব্যক্তিই সাধনায় সিদ্ধ হয়েছে।' এই বক্তব্যে উপনীত হবার আগেও বলছেন—'আমার মনে হয়, এই আনন্দের উৎপত্তি আদর্শানুরাগ থেকে। যে ব্যক্তি কোনও মহান আদর্শকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসার দরুন দুঃখ যন্ত্রণা পায়, তার কাছে দুঃখ ক্লেশ অর্থহীন নয়।' কারণ তিনি জেনেছেন—'দুঃখ তার কাছে রূপান্তরিত হয়ে আনন্দ বলে প্রতীয়মান হয় এবং সেই আনন্দ অমৃতের মত তার শিরায় শিরায় শক্তি সঞ্চার করে দেয়। আদর্শের চরণে যে আত্মসমর্পণ করতে পারে, সেই কেবল জীবনের অর্থ বুঝতে পারে এবং জীবনের অন্তর্নিহিত রসের সন্ধান পেতে পারে।'

সুভাষচন্দ্রের সাহিত্য বিষয়ে যে কি রকম দরদ ছিল, তার পরিচয় মান্দালয় জেল থেকে লেখা একটি পত্রে স্পষ্টই রয়েছে। সেখানে তিনি মানুষের দেহ ও মনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের তিনটি দৈনিক কর্মতালিকা দেন। প্রথম ব্যায়ামচর্চা, দ্বিতীয় নিয়মিত পাঠ এবং তৃতীয় দৈনিক চিন্তা বা ধ্যান। এই নিয়মিত পাঠ করার জন্যে তিনি আবার ধর্ম সম্বন্ধীয়, সাহিত্য, কবিতা, ইতিহাস প্রভৃতি সকল পঠনীয় গ্রন্থের তালিকা দিয়েছেন 'তরুণের স্বপ্ন' গ্রন্থের শেষে এটি পত্রাবলী অংশে মুদ্রিত আছে। পত্রগুলির কয়েকটি বিষয় যেমন—'সমাজসেবা ও কুটির শিল্প', 'চরিত্র গঠন ও মানসিক উন্নতি', 'জেল ও কয়েদী', 'দলাদলি ও বাংলার ভবিষ্যৎ', 'হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট', 'কারামুক্তি প্রস্তাবের উত্তর', 'জীবনের লক্ষ্য', 'দেশবন্ধু', 'উত্তর কলিকাতা অধিবাসীবৃন্দের নিকট নিবেদন' প্রভৃতি। তাঁর এইসব এক-একটি চিঠিপত্রই হয়েছে এক-একটি প্রায় ছোটো ছোটো সাহিত্য-প্রবন্ধ। চিরন্তন মানুষের নিত্য জীবনের সঙ্গে উপন্যাস ও গল্প সাহিত্যের যে যোগ, সুভাষচন্দ্রের এই পত্রসাহিত্যের সঙ্গেও সেই যোগসূত্র বর্তমান। একটি মুহূর্তের বুদবুদ কিন্তু শাশ্বত ইতিহাসের দিক চিহ্ন।

সম্প্রতি 'পত্রাবলী' নামে একখণ্ডে কিছু পত্র সংকলিত। তাঁর সব চিঠিপত্র যদিও আজও সংকলিত হয় নি, তবুও যে কটি পাওয়া যায় 'তরুণের স্বপ্ন' বা 'ভারত পথিক' গ্রন্থেও তারই বিষয় বিস্তৃতভাবে বিচার করার ও একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়

আজ পর্যন্ত তেমনভাবে সুভাষচন্দ্রের এই দিক নিয়ে বিশেষ একটা আলোচনা হয় নি।

'নূতনের সন্ধান' গ্রন্থ ১৩৩৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইংরাজি ১৯২৭ সালের মাঝামাঝি মান্দালয় জেল থেকে মুক্তি লাভের পর সুভাষচন্দ্র জনসেবায় আগের মতই আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাসে পুনর্বার কারাবরণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছাত্র ও যুব আন্দোলনে বাংলায় ও বাংলার বাইরে বহু বক্তৃতা দেন। এই গ্রন্থে সেইগুলিই সংকলিত। কতকগুলি অবশ্য ইংরেজিতে প্রদত্ত ভাষণের অনুলিখন থেকে বাংলায় অনূদিত। তিনি ছাত্র ও যুব সমাজকে চিরদিন ভালোবেসেছেন এবং ভালো করার জন্যে চেষ্টা করেছেন। পরাধীন ভারতের লাঞ্ছিত ছাত্র ও যুব সমাজের মর্মের ব্যথা উপলব্ধি করে ভাষণের জ্বালাময়ী ভাষায় সে কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন—'মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র উপায় মনুষ্যত্ব বিকাশের সকল অন্তরায় চূর্ণ বিচূর্ণ করা। যেখানে যখন অত্যাচার, অবিচার ও অনাচার দেখিবে সেইখানে নির্ভীক হৃদয়ে শির উন্নত করিয়া প্রতিবাদ করিবে এবং নিবারণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।' এই সব ভাষণের ভাষায় ভারতকে জাগাবার জন্যে মনোরাজ্যে যে বিপ্লব প্রবর্তিত করেন, পরবর্তী যুগে সে বিপ্লব সমাজের মধ্যে এসে পড়ে। সাহিত্যাশ্রিত সুভাষচন্দ্রের ভাষায় যেমন সাহিত্যরস, ভাবেও তেমনি সাহিত্যিক ভালোবাসা। তিনি বলেছিলেন তাই—'আমাদের পরাধীনতা ও বর্তমান দুর্দশা সত্ত্বেও আমাদের কবি, আমাদের সাহিত্যিক, আমাদের শিল্পী, আমাদের বৈজ্ঞানিক, আমাদের কর্মী, আমাদের বণিক, আমাদের যোদ্ধা, আমাদের খেলোয়াড়… পৃথিবীর অন্য কোনও জাতি অপেক্ষা হীন নয়।'

'বাংলার মা ও বোনদের প্রতি' প্রবন্ধটি বৈশাখ ১৩৩৭ সালে প্রকাশিত হয় 'বেণু' পত্রিকায়। পরে অবশ্য গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধে তিনি কোনোক্রমেই 'নারী নরকস্য দ্বারং' প্রবাদ বাক্যটিকে স্বীকার করেন নি! কোনো পুরুষ কবির দুছত্র কবিতা উদ্ধৃত করেছেন নিজের বক্তব্যের সপক্ষেই সহায়ক রূপে, সেই দু-ছত্র এই—

'সচল হয়েও অচল সে যে বস্তার চেয়েও ভারী,
মানুষ হয়েও সংএর পুতুল বঙ্গদেশের নারী।'

১৯২৯ সালে হুগলী জেলা ছাত্র সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণেও তিনি এই দু'ছত্র উদ্ধৃত করার আগেই বলেছিলেন—'পুরুষ অবরুদ্ধ আপন দেশে, নারী

অবরুদ্ধ নিজ নিবাসে'। প্রাজ্ঞপুরুষ সুভাষ-মানসপ্রজ্ঞায়—'নারী জাতি আমাদের সমাজের অর্ধেক।' তাই তিনি সংস্কার মুক্ত মন নিয়ে পুরুষের পাশে আত্তাশক্তির অংশরূপিণী নারীকে আহ্বান জানিয়েছেন। বলেছেন ছাত্র আন্দোলনের আহ্বান ভাষণেও শ্রীহট্টের সুর্মা উপত্যকা ছাত্র সম্মিলনের জন্যে প্রেরিত ১৩৩৬ সালে—'বাংলা দেশ—বাংলার জল, বাংলার মাটি, বাংলার আকাশ, বাংলার বাতাস, বাংলার শিক্ষা দীক্ষা ও প্রাণ-ধর্ম বাংলার নারী-জাতির মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। যে ব্যক্তি বাংলার মাতৃজাতিকে শ্রদ্ধা করিতে জানে না- সে বাংলা দেশকে কি করিয়া শ্রদ্ধা করিবে?'

'দিল্লী চলো' পুস্তিকায় আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের সময়ে নেতাজী যে সব উদাত্ত কণ্ঠে উদার ভাষণ প্রদান করেন সেগুলিই অনুলিখিত হয়ে ও অনূদিতও হয়ে গ্রথিত হয়। তাঁর অনেক লেখাই এইভাবে আমরা বাংলায় অনুলেখার পর প্রবন্ধ সাহিত্যের সামগ্রী করে নিয়েছি। এখানে মনে আসছে বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পালের অনেকগুলি রচনার কথা। সেগুলিও নানা সভায় তাঁর অভিভাষণেরই অনুলেখা।

'ভারত পথিক' গ্রন্থকে, ইংরাজি থেকে অনুবাদ হলেও, সুভাষ-সাহিত্যের যদি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলি, বোধ হয় খুব ভুল হবে না। জীবনস্মৃতি নিজের কথা নিজে বলা—সেই জন্মের দিন থেকে আর লেখার দিনটি পর্যন্ত। এ লেখায় কোনো চটুল চমক নেই, আছে এক সহজ মনের কথা সহজ সরল অথচ সুন্দর করে বলা। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতির জীবনস্মৃতি যেমন সাহিত্যের বস্তু ঠিক তেমনি 'ভারত পথিক' সাহিত্যের প্রায় রম্যবস্তুই।

সুভাষচন্দ্র দেশনায়ক, মুক্তি সংগ্রামী। তাঁর দৃষ্টিতে সমসাময়িক ভারত-বর্ষের মুক্তিসংগ্রামের চলচ্চিত্র একেবারে জীবন্ত রূপে বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে 'ভারতের মুক্তি সংগ্রাম ১৯২০-১৯৪২' গ্রন্থের দুই খণ্ডেই। তিনি ভিয়েনায় 'হোটেল ছ ফ্রান্স' থেকে ১৯৩৪ সালের ২৯শে নভেম্বর এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধ রচনা করেন। এবং এই রচনায় মৌল উদ্দেশ্যকে তিনি এইভাবে ব্যক্ত করেন—'এই গ্রন্থের লেখক তাঁহার বর্ণিত স্বাধীনতা সংগ্রামে ঘনিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন, এবং আশা করা যায় যে ঐ একই কাজে ভবিষ্যতেও লিপ্ত থাকিবেন। সুতরাং আশা করা যায় যে কাহিনীটি কৌতূহলোদ্দীপক হইবে এবং প্রসঙ্গতঃ বিদেশী পর্যবেক্ষকের নিকট ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ব্যাখ্যা করিতে সাহায্য করিবে।' এবং মুখবন্ধের উপ-

সংহারে এই গ্রন্থরচনায় তাঁকে সাহায্য করেছেন বলে শ্রীমতী ই, শেঙ্কলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। এবং বর্তমান ভারতবাসী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছেন তাঁকে যাঁর পরিশ্রমেই প্রকাশিত হয়েছে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের উজ্জ্বল-তম অধ্যায়টির ইতিহাস, একটি যথার্থই প্রামাণ্য ইতিহাস। এবং যার মধ্যে দিয়ে জানা যাচ্ছে—'অতি প্রাচীনকাল হইতে শুরু করিয়া গত তিন দশকেই শুধু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি প্রকৃত চিত্র তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা হইয়াছে।' এখানে যেন ঐতিহাসিকের মননশীলতায় উত্তীর্ণ সুভাষচন্দ্র।

এই আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে সুভাষচন্দ্র স্বদেশী আন্দোলনে যেমন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ভূমিকাকে অত্যুজ্জ্বল রেখায় অঙ্কিত করেছেন তেমনি তো আবার রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের বিশেষ ভূমিকাকেও যথাস্থানে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন কালের আলোচনায় কবির 'সংস্কৃতির ঐক্য' শিরোনামায় ভাষণের ও বাংলায় প্রধান ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব' বিষয়ের ভাষণের মধ্যে যে পরস্পর বিরোধী অভিমত তখন বাংলার স্বদেশী সমাজে আন্দোলিত হয় তাও লিপি-বদ্ধ করতে ভুল করেন নি। সেদিনের জ্বলন্ত প্রশ্ন ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বর্জন এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যান।

তাঁর কিছু ইংরেজি ভাষণ, রচনা ও পত্র নিয়ে 'ক্রসরোঁডস্' নামেও একটি সংকলন পাওয়া যায়। তারই বাংলায় অনুবাদ প্রকাশ হল 'কোন পথে?' নাম দিয়ে দু খণ্ডে। প্রথম খণ্ড ১৯৭৩ সালে ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৮ সালে ফেব্রুয়ারীতে প্রদত্ত হরিপুরা অভিভাষণ দিয়ে প্রথম খণ্ডের আরম্ভ। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত 'আমার জীবনের বাণী' রচনাটিতে দর্শনের গভীর কথা বলেছেন যেখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের বিভিন্ন মতের অভিব্যঞ্জনা। ১৯৪০ সালে জেলে থাকাকালীন রচনা এটি। এর দ্বিতীয় স্তবকেই বলেছেন—'আমার মনে হয়, প্রথমে এবং সর্বাগ্রে চিন্তাবিদ হবার জন্যই প্রকৃতি আমাকে মূলত গড়ে তুলে ছিল।'

'দেশের সামনে কর্তব্য' নামের রচনায় সুভাষ-মানসের যথার্থ দেশনায়কের পরিচয়টি উদ্‌ঘাটিত। তিনি উল্লেখ করলেন—'বিশ্বপরিস্থিতি এমনই এক পরিবর্তনের স্রোতের মধ্যে দিয়ে চলেছে যে, কোনো কোনো মহলে ভাবনা-চিন্তা বন্ধ করে দিয়ে ঘটনা-প্রবাহে ভেসে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।' তিনি এও বললেন—'আমাদের পক্ষে মারাত্মক ভুল হবে যদি আমরা মনে

করি, আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্যে উপনীত হবার পক্ষে যেহেতু পরিস্থিতি আমাদের অনুকূল, সেইজন্যে পাকা ফলের মতো স্বরাজ আমাদের হাতে খসে পড়বে।'

তাই তিনি 'নাগপুর অভিভাষণে' দাবি তুললেন—'এখানে এবং এই মুহূর্তে ভারতের জনগণকে সব ক্ষমতা দিতে হবে।' দেখা যাচ্ছে তিনি 'কাজে তৎপর হও' রচনাতেও বলছেন—'এই সব মহৎ ও বিরাট প্রয়াস চালাতে হবে একটি সর্বাত্মক ধ্বনিকে সামনে রেখে—"ভারতের জনগণকে সব ক্ষমতা দিতে হবে"। "সব নেব, নয়ত কিছুই না"—এই হবে আমাদের নীতি এবং আপসের বা মাঝ পথে দাঁড়াবার কোনো অবকাশ নেই।' এ এক বলিষ্ঠ বক্তব্য, বিশিষ্ট মানসিকতায়। এ কথা তিনি বলতে পেরেছিলেন এই কারণেই যে তিনি বিশ্বাস করতেন—'স্বদেশ সেবাব্রতের উদ্দেশ্য ছিল দেশমাতৃকার চরণে নিজের সর্বস্ব উৎসর্গ করা।' কথা কয়টি লিখেছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ১২।৮।২৫ তারিখে মান্দালয় জেল থেকে। দেশবন্ধুকে প্রথম লেখা চিঠিতে কেম্ব্রিজ থেকে লেখেন—'আমার মনে হইতেছে যে, দেশে ফিরিলে আমি কলেজে অধ্যাপনা এবং পত্রিকায় লেখা—এই দুই কাজে হাত দিতে পারিব।' তিনি উভয় কর্মই যথাযথভাবে করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতেই তাঁর অন্তরের ছবিটি সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে, লিখেছেন—'যাঁকে ভালবাসি—যাঁকে অন্তরের সঞ্চিত ভালবাসার ফলে আমি আজ এখানে—তাঁকে বাস্তবিক ভালবাসি—এই অনুভূতিটা সেই জ্বালার মধ্যেই পাওয়া যায়। তাই বোধ হয়, বদ্ধ দুয়ারের গরাদের গায়ে আছাড় খেয়ে হৃদয়টা ক্ষতবিক্ষত হলেও—তার মধ্যে একটা সুখ, একটা শান্তি —একটা তৃপ্তি পাওয়া যায়।' মনের শূণ্যতাকে শ্রদ্ধায় ভরিয়ে দেওয়া, দেশবন্ধুর স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত তখন।

বাংলায় খণ্ডে খণ্ডে 'সুভাষ-রচনাবলী' নামেও এক প্রকাশের ব্যবস্থা অতি সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে। এতে রচনাগুলিকে কালানুক্রমিক ভাবেই সন্নিবিষ্ট করা হচ্ছে। ১৯২৯ সালে 'সবুজ সংঘ'য়ের সভায় 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়' বিষয়ের আলোচনায় অনেক দিকেই আলোকপাত করে বলেছিলেন—'জীবন ও সাহিত্য—অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমাদের মধ্যে নূতন জীবন না জাগিলে নূতন সাহিত্য অসম্ভব। এই সৃষ্টির জন্য চাই ধ্বংস।' তিনি নবীনের অভ্যুদয় দেখতে চাইলেন, তিনি নতুনের জাগরণ আশা করলেন ধ্বংসের মধ্যেই। তাইতো যেন

বলতে চেয়েছিলেন এই ভাবেই—ধ্বংসের মধ্যেই সৃষ্টি, পতনের পরই অভ্যুদয়, রাত্রির শেষেই সুপ্রভাত।

৩

আজাদ হিন্দ রেডিও থেকে রাত্রের দিকে প্রচারিত সুভাষচন্দ্রের ভাষণ অতিমৃদু-স্বরে শোনার অতি-প্রলোভনকে এখন অতীত স্মৃতিমাত্র মনে হচ্ছে। তবে বড়ই সুবর্ণ স্মৃতি আমার জীবনে যেমন, বোধ হয় অনেকের জীবনেই। কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর মূর্তির পাশের ছাউনির মধ্যেও একবার শোনা তাঁর ভাষণের সামান্য মধুর কণ্ঠ ক্রমেই আমার কাছে অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। ১৯৪২ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারীর বেতার ভাষণের শেষের দিকের আশার বাণীটি কি অপূর্ব! 'ভারতের মুক্তির মধ্য দিয়াই এশিয়া তথা বিশ্ব মানব-সমাজের মুক্তিও বৃহত্তর লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইবে।' একটা সুদূর প্রসারী দৃষ্টি, একটা আশা ব্যঞ্জক ব্যঞ্জনায় ভরা ভাষণ। তবে সব থেকে সত্যি যা তা হল তাঁর চিরকালের জন্যে প্রতিটি ভারতবাসীর কাছে প্রতিনিয়তই প্রতিধ্বনিত বাণী—'জয়হিন্দ'। এত অল্প কথায় এত বড় কথা আর কে বলেছেন।

স্বল্প শব্দে কল্প-বাসনার ও অমূল্য স্বদেশ ভাবনার আমরা প্রকাশ দেখি তাঁর বক্তব্যে।

সুভাষ-সাহিত্য সুভাষচন্দ্র বসুর কথা ও কর্ম, ভাষা ও ভাষণ, বাণী ও জীবনী। সুভাষচন্দ্রের ভাবজীবনের অভিব্যক্তি লেখার স্বল্পতা সত্ত্বেও চিরন্তন। একদিকে মননশীলতা অন্যদিকে কর্তব্যের আদর্শনিষ্ঠা। আমরা দেখি তাই সুভাষ-সাহিত্য সুভাষচন্দ্রের নিছক প্রতিফলনই নয়, প্রতিকৃতিই।

সাহিত্যে স্বদেশচিন্তা ও সমাজসেবা

১

নিছক ব্যক্তি কেন্দ্রিকতার প্রাবল্যে আধুনিক জনমানসে সমাজসেবার অশরীরী অবস্থিতি। কারণ হৃদয়রাজ্যের যে সূক্ষ্মবোধ, যে বৃহৎ বোধিজ্ঞান সমাজসেবার আঙিনায় আমাদের উপনীত করবে তার অঙ্কুরোদ্গম কোথায়? বিকশিত রূপ লাভ করার পক্ষে ক্ষেত্রের প্রস্তুতিই বা কোথায়?

নেই অনুকূল মাটির সরসতা—যার গভীর গহনের অন্তর-প্রেরণায় সেবা-পরায়ণ মানসিকতাকে প্রবলভাবে সেবাব্রতী করবে। তাই সদাজাগ্রত যুব-শক্তি একটি অবক্ষয়ের ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হয়ে বিক্ষিপ্ত বিভ্রান্ত এবং বিপথগামী হয়ে উঠেছে—এ কথা বলার মধ্যে কোনো অত্যুক্তি নেই বলেই বিশ্বাস করি। হয়তো এর পশ্চাতে অভিভাবক শ্রেণীর অক্ষমতা ও পারিবারিক শিথিলতা অনেক অংশেই দায়ী হতে পারে তবু যুগের প্রভাবে, কালের প্রগতির স্রোতে, আধুনিক যন্ত্রণা-জটিল সভ্যতার রথচক্রের দ্রুত অগ্রগমনে বা অতিক্রান্ত পরিবর্তনশীলতার দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ক্ষয়িষ্ণু প্রাচীন সমাজ ও ঐতিহ্যের প্রতি বিরূপতায় উদ্দাম হয়ে ওঠে। সেখানে তাদের আস্থাহীন মন ও মনন, ভাঙনমুখী ক্রিয়াকর্মে অনুপ্রেরিত করে কিন্তু সংগঠনে নয়, সংস্কারে নয়। গভীর মমত্ব বোধের ক্রিয়াকর্মে একটি নির্লিপ্ত ঔদাসিনতা বা অবহেলায় অবজ্ঞাই প্রকাশিত করে। তাদের মানস গঠনের এই মৌল ভিত্তিই দূরে রাখে, সেবাব্রতী চৈতন্যের উদয়মার্গ থেকে।

এই বোধ ও বোধির পশ্চাতে যে অনুশীলন ও অনুভূতি, যে অনুপ্রেরণা ও আকুতি থাকলে সহজেই এই প্রয়োজনীয় মনুষ্যধর্মটি যুবশক্তির মধ্যে বিকশিত হয় তার ওপর সমকালীন বৈজ্ঞানিক মহতী অবদানও অনেকাংশে ক্রিয়াশীল। আধুনিক বিজ্ঞানের দৌলতে মানুষের মন সহজ লভ্য ভোগের উপকরণে ব্যক্তি কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। আপন সৌখিনী আরামে অনায়াস লভ্য সামগ্রী নিয়ে জীবনযাত্রাকে আত্মকেন্দ্রিক ও ভোগকেন্দ্রিক চিন্তাসূত্রে বিধৃত করেছে। আজ আমাদের এখনই একটি দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে রাত্রির অন্ধকারকে দূর করতে হয় না—বিদ্যুৎ শক্তির কৃপায় সুইচের শীর্ষবিন্দুতে আঙুলি স্পর্শেই মুহূর্ত মধ্যে আলোকিত হই। আজ আর টানা পাখার আশ্রয়ে গ্রীষ্মের দহন

জ্বালা থেকে রেহাই পেতে হয় না, সহজ লভ্য বিদ্যুৎ চালিত পাখার নিচেই শুধু কেন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষেও অবস্থিতির অবকাশ এসে গিয়েছে। আজ বিদ্যাসাগরের কালের মতো মায়ের কথায় গ্রামের বাড়িতে ছুটতে হয় না পদব্রজে, আমরা দ্রুত থেকে অতি দ্রুতযানের যুগে এসে গিয়েছি। বিশ্ব আজ ঘরের পাশে বিজ্ঞানের কল্যাণে—এ সবই সত্যি।

তবু মানসিক প্রস্তুতির জন্যে যে অনালোকিত দিকটি থেকে যাচ্ছে তার বিকাশ সাধন করবে সাহিত্য।

একজন সমাজসেবী শুধু গ্রামের কোনো জলাশয় বা পথঘাট পরিষ্কার করে বা দাতব্যচিকিৎসালয় পরিচালন করাকেই সমাজসেবার একমাত্র মাধ্যম বলেই যদি ভেবে থাকেন তা হলে বোধ হয় ভীষণ ভুল করা হবে। দেশ ও জাতির যে দ্রুত অবক্ষয় তাকে রোধ করার জন্যে মানস-সেবারও যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে—যা সাহিত্যের মাধ্যমেই সম্ভব। এ শুধুই সাহিত্যের মাধ্যমে সম্ভব – উপস্থাপিত হবে চলচ্চিত্রে অভিনয়ে বা রেডিও টেলিভিসনেও। একদিন আমাদের পরাধীন দেশের রাজশক্তি প্রবল আধিপত্য বিস্তার করেছিল এবং রেখেছিল শোষণের শাসনে, কারণ তাঁরা বিদেশী।

সেই বিদেশী রাজশক্তির প্রতাপে আমাদের সমাজজীবনে ও গ্রামজীবনে কোনো সংস্কার বা উন্নয়ন স্থানীয় জমিদার শ্রেণীর বদান্যতায় ও কিছু দরদী মানুষের সহায়তায় হয়েছে—তাঁরা জলাশয় নির্মাণ করিয়েছেন, পুষ্করিণী খনন করিয়েছেন, পথঘাট প্রস্তুত করিয়েছেন, মন্দিরাদি সংস্কার করিয়েছেন, পাঠশালা বসিয়েছেন, চণ্ডীমণ্ডপের চালাও চত্বর রচনা করিয়েছেন। উৎসব উপলক্ষে সময়-অসময়ে কথকতার আসর বসিয়েছেন, যাত্রা বা পালাগান করিয়ে অশিক্ষিত গ্রামীণ মানুষের মনে কিছু জ্ঞানালোকের দীপকণিকা প্রজ্জলিত করেছেন পরোক্ষে।

কিন্তু বিজ্ঞানের এই ঐশ্বর্যময় শতাব্দীর বুকে বসে আমরা চলচ্চিত্রে এবং বেতার বা টেলিভিসনে জ্ঞানের অভাবনীয় রসসম্পদ সহজেই পেয়ে যাচ্ছি। হাতে লেখা পুঁথির একটি পাণ্ডুলিপির ভরসায় না থেকে আজ মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে ঘরে ঘরে নিজস্ব একতিয়ারে রাখতে পাচ্ছি জ্ঞানবিজ্ঞানের বিস্ময়কর ও বহু বিস্তৃত ঐশ্বর্যকে। জানার দিগন্ত আজ বহুভাবে তাই সমৃদ্ধ। বহু ভাব ও ভাষায় আমরা উন্নত। তাই সমাজের মানস গঠনের ক্ষেত্রে সাহিত্য একটি মহত্তীমাধ্যম রূপেই গ্রহণীয়, বরণীয় এবং অবশ্যই স্মরণীয়।

৫

স্বদেশীর যুগের বাংলার বিপ্লবীরা বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' থেকে যে মহৎ প্রেরণা পেলেন, তাতেই ফাঁসীর মঞ্চে দাঁড়িয়ে গেয়ে উঠলেন 'বন্দেমাতরম' সংগীত, রাজশক্তির পুলিসী জুলুমের প্রবল আঘাত পেয়েও স্বদেশ কর্মী উচ্চারণ করেছেন 'বন্দেমাতরম'। আমাদের কর্মের একটি বীজমন্ত্র যেন সব সময়ই অন্তরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত থাকতে থাকতে যথাকালে অনুপ্রেরণার কারণ হয়ে ওঠে। সেই অনুপ্রেরণা, সেই বীজমন্ত্র কর্মে ও সাধনায় বহু বাধা বিপর্যয়ের মুখে যুগিয়ে দেয় অপরিসীম মনোবল ও অপ্রতিহত প্রতিরোধ ক্ষমতা,—যার আশ্রয়ে অসহযোগ আন্দোলন ও অহিংসা সংগ্রামে অনন্ত রসদ সংগ্রহ করে থাকে। একজন সমাজসেবীর জীবনসাধনায় এমনি অনুপ্রেরণার ভূমিপ্রস্তুতির জন্যে প্রয়োজন সাহিত্যের রাজদরবার থেকে প্রেরণার প্রদীপ শিখাটিকে অনর্গল অনির্বাণ রাখা।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন একজন যে উপকরণ নিয়ে স্বক্তো রচনা করে ভোক্তার রসনাকে তৃপ্তি দিতে পারলো না অথচ সেই একই উপকরণে সুগৃহিনী তাঁর হাতের গুণে সুপাচ্য করে তুললে স্বক্তোকে। লোক মুখে দিয়ে বলে উঠলো অমৃত। সাহিত্যেও ঠিক তেমনি পরিবেশনের গুণে পাঠক চিত্ত জয় করা যায়। অনেক রসাল কাহিনী আমাদের আপাতঃ চিন্তাকে অনুরণিত করে কিন্তু তার মধ্যে যে গভীর জীবনবোধ রয়েছে, যে কেন্দ্রিভূত চিন্তার চৈতন্যালোকও রয়েছে—তাকে বুঝতে গিয়ে দেখা যাবে, জানা যাবে বর্তমান অবক্ষয়ের সমাজচিত্র। সেই অবক্ষয়িত চিত্রের চিত্রায়নে একজন সাংবাদিক বর্ণনা দেবেন সংবাদপত্রে তাতে সুনীতিবাবুর ব্যাকরণের কোনো ত্রুটিই পাওয়া যাবে না, কিন্তু তা সাহিত্য কি? তবে তা থেকে বিষয়ের জ্ঞান হবে ঠিকই যদিও রসের ভিয়েনে নয় সাধারণ বর্ণনার মাধ্যমে। তথ্য থাকবে তত্ত্ব নয়। সমাজ সেবীর গ্রহণীয় শুধু তার মধ্যে যে সমাজ চিন্তার রসদ পাওয়া গেল তাই।

একজন সমাজসেবী তাঁর সাহিত্যপাঠের মাধ্যমে তাঁর নিজস্ব প্রেরণা যেমন লাভ করেছেন বা একজন সাহিত্যরচনা করে সমাজ জীবনের অবক্ষয়িত দিকটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে বৃহত্তর সমাজকল্যাণেরই কাজ যেমন করেছেন তেমনি সংস্কার সাধনের ইঙ্গিতও তাঁর সাহিত্যে রেখে যেতে পারেন। কারণ একজন সমাজসেবী তিনটি মৌল বস্তুর বনিয়াদ নিয়ে সেবার কাজে নিযুক্ত হবেন। সেই তিনটি কি?

(১) তিনি যে সমাজের কল্যাণকর্মে নিযুক্ত হতে চলেছেন তার যথাযথ ঐতিহ্যের পরিচয় জানবেন। (২) বর্তমান সেই সমাজ জীবনের চিত্ত, চরিত্রে ও চিত্রের সঙ্গে ঘনি-ভাবে পরিচিত হবেন। এবং (৩) নতুন সমাজ গঠনের কোনো স্বপ্ন বা আদর্শ তাঁর চোখের সামনে রেখে তিনি সমাজসেবার বনিয়াদ রচনায় আত্মনিয়োগ করবেন। এই তিনটিরই পাঠ গ্রহণ ও রসদ সংগ্রহ তাঁকে যথার্থ সাহিত্যপাঠেই গ্রহণ করতে হবে এবং সাহিত্যিককেও সেই পাঠ রচনা করতে হবে।

বঙ্কিমচন্দ্র সমাজের কল্যাণ-দৃষ্টি নিয়ে সাহিত্য-রচনার কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি নিয়ে সাহিত্যিক আপন চৈতন্যের আলোকে যে দিব্যজ্ঞান লাভ করছেন তাই সকলের মধ্যে পরিবেশন করেন। অর্থাৎ ব্যক্তির রসবোধ সমষ্টির দরবারে উপনীত হচ্ছে সাহিত্যে। একক অন্তরের প্রজ্বলিত প্রদীপ্ত শিখাটি বহুজনের অন্তরের আঙিনায় দীপাবলী রচনা করবে। সেই দীপালোকেই জ্ঞান ও কর্ম উভয়েরই উন্মেষ। সেবার জগতে যদি একজন নৈশ বিদ্যালয় খুলে অনেকজন বয়স্ক নিরক্ষর মানুষকে স্বাক্ষর করার কর্ম গ্রহণ করেন আর অপরজন সাহিত্য রচনা করে অবজ্ঞাত, অবহেলিত, অসংস্কৃত সমাজচৈতন্যের নবজাগৃতি দান করেন—তবে এই উভয়জনই তুল্যমূল্য। কারণ কল্যাণ-দৃষ্টি নিয়েই সাহিত্যিকের ভাবানুভূতি। চর্যাপদে বা প্রাচীন বাউল গানে (আধ্যাত্মিকতা রসের দিক না ধরেও সাদা-মাটা দিক দিয়ে দেখলে, দেখা যায় সমাজের অতি গূঢ় কথা সহজভাবে বলা হয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রেমের যে মহতী স্বরূপটি উদ্ঘাটিত হয়েছে তা লৌকিক থেকে অলৌকিক রসাবেদনে যেমন তেমনি বর্ণানুশাসনের যুগে সমপ্রীতি-পরায়ণতার মহতী দীক্ষায়ও। শাক্ত পদাবলী জাঁকজমকের পথ ছেড়ে সহজিয়া সাধনের ইঙ্গিত দিয়েছে। মঙ্গলকাব্যগুলো এক এক দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করতে গিয়ে তৎকালীন সমাজমানসের কথাও সোচ্চারে বর্ণনা করেছে। আমাদের পুরাণ বা রামায়ণ-মহাভারতের শিক্ষা একজন সমাজকর্মীর যেমন প্রয়োজন তেমনি আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞানভাণ্ডারের উপন্যাস, প্রবন্ধ বা কবিতাও তেমনি রসপ্রবাহের আকরভূমি। নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি নিয়ে রচিত কথাকাব্য ব্যক্তিত্বের বৃহৎ আঙিনায় উত্তরণ আনবে কারণ পাঠক তো সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুটিকে আবিষ্কার করেন।

এই কেন্দ্রবিন্দুটি কি?

না, যখন কোনো সাহিত্যিক তাঁর রসপরিবেশনায় মত্ত হচ্ছেন তাঁর সেই কর্মের স্থবির একটি অনুভূতি।

সেই অনুভূতিটি কি?

না, তিনি সমাজজীবনের একটি বিশেষ অবস্থার স্বরূপ লক্ষণটি অনুভব করে ব্যক্তি-অনুভূতিটিকে সমষ্টির জন্যে পরিবেশন করলেন। কিন্তু তাই বলে যে তাঁর পরিবেশনায় কোথাও ঠিক বলা থাকতেই হবে সেই কেন্দ্রবিন্দুটির অনুভব এমন নাও হতে পারে। যেমন একজন আধুনিক লেখক সমাজের অবক্ষয় যুব শক্তির উদ্দাম অসহিষ্ণুতা এবং দ্রুত সমাজজীবনের মূল্যমানের অবনতির বেদনাকে তাঁর কাহিনীর বিষয়বস্তু করলেন। এখন কাহিনীর মধ্যে থাকলো বলিষ্ঠ যুবকদ্বয়ের অবর্ণনীয় ও আক্ষেপজনক দ্বন্দ্ব সংঘাত ও অকাল বিনষ্টি। এখন এই কাহিনীর চিত্ররূপ বা গ্রন্থ পাঠে যদি আমাদের এই শিক্ষাই হয় যে তাদের বলিষ্ঠ শারীরিক শক্তির বিকাশটিই গ্রহণীয় এবং সেই বিকাশপ্রাপ্ত বলিষ্ঠতায় যে বাস্তবের সঙ্গে সংঘাত সেটি পৌরুষব্যঞ্জক, তা হলে কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু ধরা হল না। সমাজের ক্ষয়িষ্ণু স্বরূপটিকে বোধ করে যে বেদনা সেটিই কেন্দ্রবিন্দু সাহিত্য-সৃষ্টির এবং সেটিই গ্রহণীয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের যে ঐতিহাসিকতা ও আভিজাত্য তা তৎকালীন সমাজ মানসের ও পরিবেশের কথা জানায়। রবীন্দ্রনাথের বৃহৎ অনুভূতির রাজ্য মহতী রসায়নের আস্বাদ দেয় আর শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের মধ্যে পল্লীসমাজের কুটিল ও জটিল সমস্যাগুলির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটিয়ে থাকে। শরৎচন্দ্রের একটি চরিত্র ফুটিয়ে তুলছে ব্রাহ্মণশাসিত সমাজের চেহারা আর অন্য একটি চরিত্র ফুটিয়ে তুলছে নব্যশিক্ষিত যুবশক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা। এদের মধ্যে যে সংঘাত রচনা হল তা থেকেই সমস্ত সমাজ-বোধের পাঠগ্রহণ করায়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে যেমন স্বদেশ ভাবনা জাগায় তেমনি আমাদের কাব্যের জগতেও বিচরণ করলে দেশের প্রতি প্রীতিপ্রসন্ন মানসিকতায় প্রস্তুতি হয়। অতুলপ্রসাদ বা মুকুন্দদাসের গান চারণসংগীত হয়েছে। তাই সাহিত্যে স্বদেশচিন্তা আর সমাজসেবা বহুমুখী এবং বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত।

তবে নিছক সমাজসেবীর সাহিত্যপাঠ থেকে তিনটি মৌল বিষয় গ্রহণীয়— অতীত সমাজ, বর্তমান সমাজ ও ভবিষ্যৎ সমাজ। কারণ একজন সমাজব্রতীর জানা প্রয়োজন কোন সমাজের ঐতিহ্যভূমিতে কর্মসূচিত, কোন সমাজের

প্রেক্ষিতক্ষেত্রে বিচরণ করছি এবং কোন সুদূর চিত্র নিকট কালের সংস্কারকর্মে ব্রতী করেছে এবং কিসের আদর্শে এই ব্রত গ্রহণ।

সমাজের অবক্ষয় নানা ভাবে সুসংস্কৃত সুশিক্ষিত ও পরিশীলিত মানসিকতাকে পীড়িত করেছে। একটি সুখ-সুন্দর সহজ নির্মল জীবনযাত্রাকে জটিল জিজ্ঞাসায় অস্থির করে তোলে। তখন সমাজের ঘৃণিত চেহারা আমাদের মনকে নাড়া দেয়, আমাদের অবদমিত শুভবুদ্ধিকে প্রকাশের পথ আবিষ্কার করতে সুযোগ দেয়। তার জন্তে একটি প্রেরণার রসায়ন থাকাও প্রয়োজন তা সাহিত্যের আঙিনায় থাকে। যেমন একজন সাহিত্যিক তাঁর সৃষ্টির সম্ভারে তুলে ধরলেন জীবননাট্যের এক কদর্য চিত্র, যা বাস্তবে হয় তো ঘটছে বা ঘটতে পারে, কিন্তু আমরা সেই অশালীন অসামাজিক কর্মের জীবন্ত বর্ণনা থেকে নিজেরা সমাজের সেই দূষিত ক্ষত যেন পুনরায় আমাদের সামনে না ঘটে তার জন্তে সচেতন থাকবো—এই থেকেই সেই কাহিনী পাঠের কেন্দ্রিভূত যে শিক্ষা তা সমাজসেবার মহৎ সম্পদ। সাহিত্যে রাম ও রহিমের দ্বন্দ্ব বা রামায়ণের মনসমীক্ষা যেমন থাকবে তেমনি একজন কবি তাঁর চোদ্দ অক্ষরের পয়ারে যে অনুভবের রসবস্তু দান করলেন বা একজন প্রবন্ধকার তাঁর প্রবন্ধে যে গভীর জ্ঞানের কথা বললেন তাও কল্যাণকর। আমাদের দেশের ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের বা রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ তো বটেই এমন কি সুভাষচন্দ্র বসুর 'তরুণের স্বপ্ন' বা 'নূতনের সন্ধান' প্রবন্ধাবলীতে বা বিপিনচন্দ্র পালের প্রবন্ধাবলীতে যে স্বদেশ ভাবনার কথা রয়েছে তা বিদেশী মনীষীদের সমাজ কথা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে সমান তালেই পাঠ করার।

মন আমাদের অভ্যাসের দাস—এ কথাটা শোনা থাকলেও আজ যখন কাজের কথায় আমরা অনুপ্রবেশ করি তখন দেখি যে অভ্যাস করে কিছু একটা রপ্ত করার সময় সব ক্ষেত্রে জোটে না। যেমন উত্তর বঙ্গের প্রচণ্ড বন্যায় স্বরাজ সাধনার কাজ আপাতত একটু ঢিমে তালে রেখে বন্যাত্রাণেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন সুভাষচন্দ্র প্রমুখ স্বদেশ হিতৈষী পুরুষেরা। অভ্যাস নেই বলে সে কাজ ফেলে রাখা যায় নি। প্রয়োজনের তাগিদটাই বড় জিনিস। আর্তের সেবা, কষ্টকে লাঘব করার মানসিকতাটাই তো সাহিত্যপাঠের শিক্ষা, যাকে বলা যায় বিবেকবান ও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন হওয়ার শিক্ষাই।

বিবেকানন্দের সমাজ সেবার—শিব জ্ঞানে জীব সেবার—বাণী ও বিভূতি অনুপ্রেরণার যথার্থই আশ্রয় স্থল।

আজ আমরা যে জীবন ও জগতের মধ্যে দিয়ে ক্রমেই অগ্রসর হচ্ছি সেখানে সেবার ব্রত গ্রহণ ঠিক আগের ছকে হবে না। সমাজসেবা ও সাহিত্যসেবা স্বদেশসেবারই বিভিন্নমুখী বিস্তার রূপে গ্রহণীয় হয়েছে এতদিন সর্বদেশেই। আজ জীবনজটিলতা ও মানসযাত্রার বিচিত্র গতির ফলে একত্রে বাস একত্রে মিলে বড় কাজ করা প্রয়োজন কিন্তু হচ্ছে কমই। তবুও তো করার অন্তঃপ্রেরণাটা চাই। প্রচেষ্টার প্রাবল্য চাই।

তা আসবে কোথা থেকে?

আসবে না-কি সাহিত্যেরই শুভ কর্মপথে পরিচালনের উদ্দীপ্তি থেকে? আসবে না-কি সাহিত্যিকের শুভবুদ্ধির কল্যাণদীপ্তি থেকে? যেখানের আলোকে আলোকিত হবে সমাজ, স্বদেশ ও সভ্যতা। যেখানের পরিবেশ শুভ্রতার বিশুদ্ধতায় সমাজজীবকে সামাজিকবোধ ও বুদ্ধি দান করবে, সংস্কৃতি সেবী ও সমাজসেবীরূপেই অনুব্রতী করবে।

সাহিত্যিক যদি একটি কাহিনীর মধ্যে সমাজসেবার বর্ণনা দেন তা হলেই তা সমাজ কল্যাণমূলক হল কিন্তু তাতে সমাজসেবা বলতে যে সুদূর প্রসারী সুফল তা নাও হতে পারে। অর্থাৎ তা নিছক প্রচার সাহিত্যই হয়ে যাবে। সৎসাহিত্য যদি সমাজের অন্যায় আর অসংগতির কথা পরোক্ষে প্রকাশ করে এবং তা মানুষের মনে অশুভ চিত্রে শুভবোধ যে কি তা জাগায় তা হলে তারই মর্যাদা অনেক। কিন্তু সংবাদপত্রের সংবাদ আর প্রচারমূলক সাহিত্য অনেকটা সাময়িকীর পর্যায়েই এসে যায়।

তবে সাহিত্য চিরকালের একটা অভাবনীয় আস্বাদের মধ্যেই ভাবনার বিস্তৃততর ব্যঞ্জনা নিয়ে আত্মপ্রকাশিত।

অভাবনীয় আস্বাদনের জন্যেই সাহিত্যের আকর্ষণ। এবং এখানেই হয় তো সহিত বা সঙ্গবোধের উপলব্ধিও।

প্রাবন্ধিকের প্রতিবেদন

'স্বদেশ সাহিত্য ও মননশীলতা' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্ন পরিবেশের প্রভাবে উৎসারিত হলেও একটা মানসিকতার সাযুজ্য আছেই। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা বলেই এখানে একত্রে জোট বেঁধেছে।

মননশীল সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে বর্তমানের জীবিত জ্যেষ্ঠপুরুষ ভাষাচার্য ডক্টর সুকুমার সেন, তাঁকেই এই প্রবন্ধ সমষ্টির গ্রন্থটিকে উৎসর্গিত করার সুযোগ গ্রহণ করা হল।

বিশিষ্ট দার্শনিক ও প্রাজ্ঞপুরুষ ডক্টর হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমানে মননশীল ও চিন্তাবিদ সমাজের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তাঁর অপরিসীম স্নেহ ও অজস্র উৎসাহই আমায় প্রবন্ধ রচনায় অগ্রসর হবার কাজে প্রতিনিয়তই অনুপ্রেরিত করেছে। গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করে তিনি আমার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ-ভালোবাসার শাশ্বত-স্বাক্ষর রাখলেন। আমার চলার পথের নতুন পাথেয়।

প্রতিটি প্রবন্ধই প্রথমে স্বল্প পরিসরে খণ্ডে খণ্ডে নানা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বা কোনো-না-কোনো স্থলে আলোচিত। গ্রন্থের মধ্যে গ্রথিত হবার সময় অবশ্য প্রাথমিক স্তর থেকে অনেকটাই পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত হল। অনেক ক্ষেত্রেই ছোটো ছোটো রচনাকে একত্রে এনে অর্থাৎ একসূত্রে গেঁথে নতুনতর নামকরণের প্রচেষ্টাও আছে।

'বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য ও মননশীলতা' নামের প্রথম প্রবন্ধটি ১৩৮৫ বঙ্গাব্দে রচিত হয় 'সাহিত্যতীর্থ' রজতজয়ন্তীবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত বার্ষিক সংকলনের জন্যে। এর শেষ অংশ নতুনভাবে সংযোজিত।

'ঊনবিংশ শতাব্দী ও রবীন্দ্রনাথ' রচনাটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে বড়ই বেদনার ইতিহাস। আকাশবাণীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তরুণ কবি যোগব্রত চক্রবর্তী। তারই অনুরোধে লিখি বেতারের দশ মিনিটে পাঠের উপযোগী করে। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে সে আসে নি আর, পরে সংবাদ পাই শুধু এই যে, তার মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল বোধ হয় বেহালার কোনো পুকুরের ধারে। তাই জড়িয়ে আছে ব্যক্তিগত দুঃখের স্মৃতি, এক বেদনার্ত দীর্ঘশ্বাস। পরে 'রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়েছিল বর্ধিত আকারে। তার পর আরো পরিবর্ধিত হয়ে গ্রন্থস্থ হল।

'মনন-জাগৃতি ও মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত' প্রবন্ধের দুটি অংশের মাত্র প্রকাশ

ঘটে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'যুগান্তর' পত্রের পয়লা শ্রাবণ তারিখে অক্ষয় দত্তের জন্মের দেড়শত বার্ষিকীর দিনে। সেদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইনষ্টিটিউটে যে বৈকালী সভা হয় তার সভাপতি ছিলেন আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি অভিভাষণেও উল্লেখ করেছিলেন এই প্রবন্ধের কথাটি যে, তা আজও ভাবলে ভীষণ অভিভূত বোধ করি।

'বঙ্কিমচন্দ্র ও আমরা' রচনাটির অংশে অংশে প্রকাশ হয়েছে 'বর্ধমান' নামের পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় ও 'চৈতক' পত্রের ১৩৮৬র শারদীয়া সংখ্যায়। এবং এর প্রথম খসড়াটি কলকাতা আকাশবাণী থেকে প্রচার হয়, তাকেই এই লেখার আরম্ভের গোড়ার কথা বলে ধরা যায়। নৈহাটিতে বঙ্কিম-জন্মোৎসবে প্রদত্ত ভাষণেরও বক্তব্যবিষয় যে অপ্রবিষ্টই হয় নি, তাও বলা যায় না।

'সাহিত্যদর্পণে শরৎচন্দ্র' প্রবন্ধটি লেখার প্রয়োজন হয় শরৎচন্দ্রের জন্মশত-বর্ষের 'রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা'র জন্যে। গ্রন্থভুক্তির জন্যে অবশ্যই পরিবর্ধিত হয়েছে যে, তা বলাই বাহুল্য। এই নতুন সংযোজিত অংশের অনেকটাই 'আড্ডা' পত্রিকার ১৩৮৬র শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত "তরুণের বিদ্রোহ' ও শরৎচন্দ্র' নামে।

'সুভাষ মানস স্বদেশ ও সাহিত্য' রচনার কিছু অংশ প্রথম 'লোকসেবক'য়ের রবিবারের পৃষ্ঠায় 'সুভাষ-সাহিত্য' নামে প্রকাশিত হয়। 'যুগান্তর' সাময়িকীর শেষ পৃষ্ঠাতেও অনেক পরে মুদ্রিত হয় অন্যভাবে। 'সুভাষ মানস' আলোচনা হিসেবে প্রথম অংশ 'সাহিত্যতীর্থে' বর্ণিত। বর্তমান গ্রন্থায়িত রূপকে অবশ্য বহুবলয়িত আকারেই বলা যায় আত্মপ্রকাশিত।

'সাহিত্যে স্বদেশচিন্তা ও সমাজসেবা' রচনাটিকে অপ্রকাশিত বলছি। কারণ ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে তাঁদের সমাজসেবা শিক্ষণ প্রকল্পের একটি ক্লাসের ছাত্রদের 'সাহিত্যে সমাজসেবা' সম্পর্কে ভাষণ দিতে অনুরোধ করায়, সেদিনেই প্রদত্ত বক্তব্যের এটি লেখন রূপ মাত্র।

প্রত্যয়সিদ্ধ ভাবে যা মানা যায় তাই বলাই তো প্রতিনিয়তই প্রার্থিত। রচনার প্রতিক্ষেত্রেই সেটুকুই প্রচেষ্টা বা সেটুকুরই প্রকাশ।

মননশীলতা সাহিত্যে বা মননধর্মী স্বদেশ ভাবনাকেই যদি মূলসূত্র ধরি তা হলে বোধ হয় প্রবন্ধগুলির স্বভাবগত সাদৃশ্যে পাঠকের রসগ্রহণ সহজসাধ্য হবে এবং মনের কোণে বা অনুভূতিমার্গে অনুরণিত হলেও হতে পারে।

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক